পশ্চাৎপট

ইন্দ্র মিত্র

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

প্রকাশক ·
গোপালদাস মজুমদার
ডি এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

মুদ্রাকর
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা

আড়াই টাকা

কবি শ্রীআলোক সরকার
বন্ধুবরেষু

এক

সেকালে ছাপাখানা ছিলো না। লিপিকার ছিলেন।

গ্রন্থকার—লিপিকার উভয়ের পক্ষেই যে-দ্রব্য অপরিহার্য, তা হ'লো কালি। সেই কালি তৈরির একটা মোক্ষম ছড়া :

তিল ত্রিফলা সিমূল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
লৌহ পাত্রে লোহায় ঘসি
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।

তিল ত্রিফলা সিমূল—ছাগদুগ্ধে মেলাও। তারপর লোহার পাত্রে লোহায় ঘষো। ব্যস্, এবার যে কালি তৈরি হ'লো, তার লেখা নির্ঘাত অতিশয় মজবুত হবে। পুঁথির পাতা যদি বা ছিঁড়ে যায়, এই কালির লিখন পাতা ছাড়বে না। অন্তত ছড়াটা যিনি কেটেছেন, তিনি তো তাই বলছেন।

তা যে কালিতেই হোক, গ্রন্থকার একখানা পুঁথি লিখলেন তো তার নকল করলেন এক লিপিকার। পুঁথিটা পাঠকদের উত্তম বোধ হ'লে, আবার নকল হ'তো। নকল লিখবেন কে? লিপিকার আছেন। পারিশ্রমিকের বদলে লিপিকার নকল ক'রে দেবেন।

কবে-কোথায়-কখন পুঁথি নকল করেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিকার লিখে রাখতেন পুঁথির শেষে। শুধু সন-তারিখ লিখেই ক্ষান্ত হতেন না, লিখতেন বার-বেলা, তিথি-নক্ষত্র,

পর্যন্ত প্রহর-দণ্ড-পল, এই পুঁথির কে মালিক, কে পাঠক। দক্ষিণার কথাও থাকতো। পুঁথিখানা নকল ক'রে নগদ কতো পেয়েছেন, কখানা গামছা, কখানা কাপড়। এমন কি, লিপিকারের আত্মকথাও থাকতো একটুকরো; তার সাধ-আহ্লাদ, তার খ্যাতি-অখ্যাতি, মুদ্রাদোষ, গৃহবিবাদ, ধর্মমত—সব, সব।

পলাশী-যুদ্ধের বছর পাঁচেক আগে এই কলকাতায়ই 'কালিকামঙ্গল' পুঁথির একখানা নকল করেছেন আত্মারাম ঘোষ। পুঁথির শেষে ঘোষমশাই লিখেছেন: এই পুস্তক শ্রীযুত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা স্থতান্নটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মহা শ্রাবণ। ২৭ রোজ শুক্রবার। দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা একজোড়া কাপড় আর দুই তঙ্কা আরকাট।

তখন পর্যন্ত ইংরেজরা ট্যাকশাল বসাতে পারেনি কলকাতায়। ইংরেজদের ট্যাকশাল তখন দক্ষিণে, আর্কট শহরে। তার থেকেই ঐ টাকার নাম ছিলো আর্কট টাকা। ঘোষ মশাই নগদ তেমনি দুটো তঙ্কা পেয়েছিলেন।

আরেকজন লিপিকার গঙ্গাধর নন্দী। ইনি 'পাটসালে' ব'সে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দর মনসামঙ্গলের (ভাসান) একখানা নকল লিখেছিলেন। পুঁথি-সমাপ্তির সময়—বেলা এক প্রহর, বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ, সন ১২১৩ সাল।

পুঁথির অন্তে এক পদ্যে নন্দীমশাই, বলতে গেলে, অনেক কথা গেয়ে ফেলেছেন। বগীলা গ্রামে ওর মাতুলধাম। মাতুলান্নেই উনি প্রতিপালিত। সেই বগীলা গ্রামের যিনি তালুকদার তিনি মোটা কায়েস্থ এবং প্রজাবাৎসল্যে শ্রীরাম-সমান। ইত্যাদি, ইত্যাদি

লিপিকারদেরও ভুল হ'তো। সেকথা লিপিকারেরা অস্বীকার করেননি। সবিনয়ে স্বীকার করেছেন, সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন পাঠকদের, যেন তারা সতর্ক হ'য়ে পুঁথি পাঠ করেন।

ভুলের কথায় লিপিকারেরা উদাহরণও টেনেছেন বিস্তর। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সরস্বতীর মুখনিঃসৃত বাক্যই কি সর্বদা ভ্রমশূন্য? মহাবলশালী হাতির কি কখনো পদস্খলন হয় না?

কিম্বা বলি, ভীমের মতো যোদ্ধাও তো রণে ভঙ্গ দিয়েছেন, মুনিদেরও তো মতিভ্রম হয়। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। তবে?

লিপিকার তো পুঁথি রচনা করেননি, লিপিকার শুধু নকল করেছেন। বলেছেন—যেমন দেখেছি, তেমন লিখেছি, আমার কোনো দোষ নেই। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোষ নাস্তি।

একখানা পুঁথি নকল করা চাট্টিখানি কথা নয়। তার জন্যে প্রয়োজন অখণ্ড অধ্যবসায়, প্রভূত পরিশ্রম। এত কষ্টের পুঁথি অবশ্যতই বহু যত্নের যোগ্য। সেই মর্মে লিপিকারেব উপদেশ আছে:

> এই গ্রন্থ নিজ সিস্য বিনে অন্যেরে না দিবে।
> প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে॥

গোপনে রেখো, আপন শিষ্য ছাড়া অন্য কাউকে দিও না। পুঁথিকে পুত্রের মতো সযত্নে পালন ক'রো, শত্রুর মতো কঠিন বন্ধনে বেঁধো। পুঁথি যদি শিথিলবন্ধন হয়, তাহ'লে দুদিনেই ওর অবস্থা শূন্য হ'য়ে যাবে।

তবু ভয় আছে, চোরের ভয়। আহা, এত কষ্টের পুঁথি কি না শেষকালে চোরের হাতে চ'লে যাবে। তাহলে আর দুঃখের অবধি থাকবে না।

চোরের চিন্তায় লিপিকার কম বিব্রত হননি। লিখেছেন :

পুস্তক দেখিয়া জেবা না দেয় জেই জন।
সাক্ষাতে নরকভোগ করে সেই জন ॥

এ তো তবু ভালো। যে-জন পুঁথি দেখে ফেরৎ দেবে না, নরকভোগের নিদারুণ অভিশাপ বাক্য শুধু তারই উদ্দেশে। পিতাসমেত চোরের উদ্দেশে শাপবাক্য আছে আরেক জায়গায়—এই পুস্তক যে চুরি করবে, সে কানা হবে; আর মৃত্যুর পরে সে তো স্বর্গে যেতে পারবেই না, তার পিতাও নরকস্থ হবে।

আরেকটায় একেবারে বংশ নিয়ে টানাটানি।—অজস্র কষ্টে অর্জিত এই পুস্তক যে চুরি করে, তার বংশক্ষয় অনিবার্য।

ছোটোখাটো শাপ তো এন্তার আছে। এ-পুস্তক যে চুরি করে, সে গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ করে। এ-পুঁথি যে চুরি করবে, সে বোবা হবে। এ পুস্তক যে চুরি করবে, তার হাত কাটা যাবে।

এ-বিষয়ে একজন লিপিকারের দু-পংক্তি মোক্ষম সংস্কৃত দেখুন :

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থ যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ শূকরী তস্য পিতা ভবতি গর্দ্দভঃ ॥

যত্নে-লেখা গ্রন্থখানা যে জন চুরি করে, তার মাতা শূকরী এবং পিতা গর্দভ। শাপবাক্যের বৈচিত্র্য ছিলো বটে সেকালে!

সেকালে ছাপাখানা ছিলো না। ছাপাখানা হবে কী ক'রে, বাঙলা ছাপার হরফই তো তৈরি হ'লো এই সেদিন। যে-বইয়ে সর্ব-প্রথম বাঙলা ছাপার হরফের চেহারা দেখা যায়, তার নাম—A Grammar of the Bengali Language প্রকাশকাল—১৭৭৮ সাল। বইখানা ছাপা হয়েছে হুগলীতে; এণ্ড্রুসের ছাপাখানায়। লেখক -ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। একজন সাহেব

তা প্রথম বাঙলা ছাপার হরফ যিনি বানিয়েছেন, তিনিও একজন সাহেব। চার্লস উইলকিন্স। হ্যালহেডের বন্ধু। সখ ক'রে এককালে উইলকিন্স বাঙলা হরফ তৈরির দিকে এক-আধটু নজর দিয়েছিলেন। তারপর একদিন স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুরোধ এলো উইলকিন্সের কাছে বাঙলা হরফ তৈরির জন্যে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন উইলকিন্স, নিজের হাতেই সব করতে লাগলেন—ছেনি কাটা, ঢালাই, ছাপা—সব কিছু। প্রথম থেকেই বাঙলা ছাপার হরফ তৈরির ব্যাপারে উইলকিন্সের যিনি সহকর্মী ছিলেন তিনি বাঙালী, পঞ্চানন কর্মকার। এই মানুষটির হাতে ক্রমে অনেক উন্নত হয়েছে বাঙলা ছাপার হরফ। পঞ্চানন কর্মকার নিজের জামাই মনোহরকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন ছেনি কাটার কাজ। আরো কয়েকজনকে শিখিয়েছিলেন। হরফ তৈরিতে মনোহরের ছেলে কৃষ্ণ মিস্ত্রীরও বিস্তর সুখ্যাতি ছিলো।

ছাপার হরফ না হ'লে যেমন হয়েছে তেমন কাণ্ড হ'তো না। এত লালিত্য-লাবণ্য, এত দ্যুতি-দীপ্তি আসতো না, এমন বিচিত্ররূপে প্রসারিত হ'তে পারতো না বাঙলা সাহিত্য। যত হয়েছে তত সাময়িক পত্র-পত্রিকাই কি প্রকাশিত হ'তে পারতো, প্রচারিত হ'তে পারতো? আর কে না জানে, সাময়িক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আত্মীয়তা অতিঘনিষ্ঠ।

বাঙলাদেশে, শুধু বাঙলাদেশে বলি কেন, ভারতবর্ষে প্রথম যে-পত্রিকাটি বেরোয়, তার ভাষা ইংরেজি। পত্রিকাটির নাম—বেঙ্গল গেজেট। প্রকাশক—জেমস অগাষ্টাস হিকি। তাঁর নাম উঠলেই আরেকজনের নাম মনে পড়ে—উইলিয়ম হিকি।

আঠারো শতকের শেষাশেষি একদিন ব্রেকফাষ্ট করতে যাবেন, হেনকালে একখানা চিঠি পেলেন উইলিয়ম হিকি। চিঠিখানা যিনি

লিখেছেন, তিনিও আরেক হিকি, জেমস অগাষ্টাস হিকি। অগাষ্টাস হিকি চিঠি লিখেছেন জেলখানা থেকে। অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং জরুরী বক্তব্য আছে তাঁর ; এখন উইলিয়ম হিকি যদি জেলে গিয়ে দয়া ক'রে একবার দেখা করেন তাঁর সঙ্গে !

জেলখানার কয়েদী, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি একজন এমন ক'রে অনুরোধ করেছেন, যাই, শুনে আসি তাঁর বক্তব্য।

উইলিয়ম হিকি একজন এটর্ণী। শুনতে গেলেন। অগাষ্টাস হিকির মুখে শুনে এলেন।

অগাষ্টাস শপথ ক'রে বলেছেন যে তিনি নির্দোষ। শক্রর ষড়যন্ত্রে তিনি আজ জেলখানার কয়েদী। তাঁর বিরুদ্ধে শক্ররা যে-সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করেছে, সেগুলো সর্বৈব মিথ্যা। সাত বছরের অধিককাল হ'লো ভারতবর্ষে এসেছেন অগাষ্টাস হিকি, তার মধ্যে দু-বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে জেলখানায়। প্রতিকার চাই, সুবিচাব চাই। অগাষ্টাস হিকি এ-বিষয়ে উইলিয়ম হিকির কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

ঘটনাটা উইলিয়ম হিকি যথারীতি এসে বন্ধুবান্ধবদেব কাছে সবিস্তারে বললেন। বন্ধুরাও পরামর্শ দিলেন যথারীতি। সাহায্য করতে চাও, ভাল কথা ; কিন্তু ওকালতি করবার আগে ভালো ক'রে লোকটাব খবরাখবর জেনে নাও। খবরাখবর কিসের আবার, অগাষ্টাস হিকি সাংঘাতিক ব্যক্তি। ওর পক্ষে যে ওকালতি নিয়ে দাঁড়ায়, কদর্য ভাষায় গালাগালি ক'রে তাকেই ও পথে বসায়। ওর হ'য়ে দাঁড়াবে কোন মূর্খ? অগাষ্টাস হিকি একটা মিথ্যুক, একটা ভ্যাগাবণ্ড, একটা স্কাউণ্ড্রেল ইত্যাদি।

উইলিয়ম হিকি তথাপি দমলেন না। গেলেন অগাষ্টাস হিকির কাছে। পুরো-পাক্কা প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন অগাষ্টাসের

কাছে। যিনি ল-ইয়ার তিনি যেমন চালাবেন, কেস তেমনি চলবে। এ-বিষয়ে অগাষ্টাস যদি অন্যথা করে, তন্মুহূর্তে মামলা বন্ধ হ'য়ে যাবে। অগাষ্টাস রাজি আছে? আছি।

সে-সময়ে মেসার্স টিলম্যান এণ্ড মোর্স নামজাদা কৌঁসুলি। উইলিয়ম হিকি তাদের দ্বারস্থ হলেন। অগাষ্টাস হিকি আমার মক্কেল, এই নাও তার ব্রিফ, তার মামলার ভার।

ওঁরা নিলেন। যাক, উইলিয়ম হিকি মনে মনে ভাবলেন, ভালো হাতেই পড়েছে মামলাটা। এখন দেখি।

কয়েকদিন বাদে শুনানি আরম্ভ হ'লো। সেদিন অগাষ্টাস হিকিও আনীত হয়েছেন আদালতে। টিলম্যান জেরা করছেন একজন সাক্ষীকে, অগাষ্টাস হিকি নিঃশব্দ শ্রোতা।' হঠাৎ কী হ'লো, অগাষ্টাস হিকির ক্রুদ্ধ চিৎকার; সেই চিৎকারের লক্ষ্য টিলম্যান, সেই চিৎকারের অর্থ হচ্ছে এই যে, কেমন ক'রে জেরা করতে হয়, টিলম্যান তা জানে না।

আদালতের মধ্যে আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে অগাষ্টাস হিকি এই অভদ্র ব্যবহার দ্বারা আবার প্রমাণ করলেন যে তাঁর স্বভাব এখনো অপরিবর্তিত আছে।

না, আর কিছু করবার নেই অতঃপর। টিলম্যান ব্রিফ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মক্কেলের। মক্কেল কিসের, ওটা একটা চূড়ান্ত……

কিন্তু হঠাৎ কোর্টের মধ্যিখানে একখানা নাটক হ'য়ে গেলো।

হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন অগাষ্টাস হিকি, বারবার ক্ষমা চাইলেন জজসাহেবদের কাছে আপন অসদ্ব্যবহারের জন্যে। উইলিয়ম হিকির কাছে ক্ষমা চাইলেন এবারের মতো, এবার যদি উইলিয়ম হিকি ক্ষমা করেন, তাহলে…তাহলে আমি কোর্ট

ছেড়ে চ'লে যাবো, ল-ইয়ারেরা যেমন করেন তেমনি হবে···
বলতে বলতে অগাষ্টাস হিকি হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললেন।

চীফ-জাষ্টিস ছিলেন তখন স্যর ইলাইজা ইম্পে। এই কান্নায় তিনি আর্দ্র হলেন। অতঃপর তাঁর কথায় উইলিয়ম হিকি ক্ষমা করলেন অগাষ্টাস হিকিকে, টিলম্যান অনিচ্ছুক হাতে আবার ব্রিফ তুলে নিলেন। আবার মামলা চললো। শেষ হলো। রায় বেরোলো —অগাষ্টাস হিকি নির্দোষ।

জেলে থাকতেই মাথায় এসেছিলো, জেল থেকে বেরিয়ে এসে অগাষ্টাস হিকি স্থির করলেন, একখানা সংবাদপত্র বের করবেন। এই কলকাতায় সংবাদ আছে বিস্তর, কিন্তু সংবাদপত্র নেই একখানাও। কিন্তু ছাপাখানা কোথায়? কলকাতায় ছাপাখানা নেই। হিকি উঠে-প'ড়ে লাগলেন ছাপাখানার জন্যে।

দৈনিক পত্রিকা—না, আপাতত অতো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরকার নেই -আপাতত একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দিয়ে আরম্ভ হোক। প্রথম যেদিন (২৯ জানুয়ারি, ১৭৮০) হিকির সপ্তাহিকপত্র (বেঙ্গল গেজেট) বেরোলো, অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার সমস্ত সংখ্যা বিক্রী হ'য়ে গেলো।

কিন্তু ঐ পত্রিকাই শেষ পর্যন্ত কাল হ'লো হিকির।

বাছ-বিচার না ক'রে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, এমন কি ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও নাকি অপমানকর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন হিকি। কিন্তু মাননীয় ব্যক্তিরা নিঃশব্দে কেন সইবেন? হিকির বিরুদ্ধে একাধিক মানহানির মামলা উঠলো আদালতে।

পত্রিকার দৌলতে ইচ্ছে থাকলে দিব্যি সুখে-শান্তিতে থাকতে পারতেন হিকি। কিন্তু পারলেন না। উদ্দাম তাঁর চরিত্র, অশান্ত তাঁর ভাগ্য।

শেষ পর্যন্ত ঐ পত্রিকার জন্যেই সর্বস্বান্ত হলেন হিকি।

যা হোক, 'বেঙ্গল গেজেটের' পরে 'ইণ্ডিয়া গেজেট,' 'ক্যালকাটা গেজেট,' 'হরকরা', প্রভৃতি আরো কয়েকটি পত্রিকা বেরিয়েছিলো। সব পত্রিকারই সম্পাদক সাহেব এবং ভাষা ইংরেজি। তখন কোম্পানীর আমল। ওসব পত্রিকার ভাষা-ভঙ্গি কোম্পানির পছন্দ হ'লো না। আইন হ'লো- সেক্রেটারি পরীক্ষা ক'রে না দিলে কোন খবর পত্রিকায় ছাপা হবে না। আইন করে দিলেন লর্ড ওয়েলেসলী। ১৭৯৯ সালের মে-মাসে। অতঃপর প্রকাশিতব্য সব রচনাই ছাপানোর আগে সেক্রেটারীর কাছে দাখিল করতে হ'তো। অপছন্দ হ'লেই সেক্রেটারী কেটে দিতেন। অনেক সময় সম্পাদকীয় রচনা তারকা-চিহ্নিত হ'য়ে বেরিয়েছে। সেক্রেটারির কলমে যা কাটা পড়েছে, শেষ মুহূর্তে তা আর জোড়া দেওয়ার উপায় থাকেনি।

ও-আইন সতেরো বছর বাদে রদ হ'লো। লর্ড হেস্টিংস তুলে দিলেন। নিয়ম হ'লো—কোনো পত্রিকায় সরকারের কিম্বা জনসাধারণের অহিতকর কিছু ছাপা হ'তে পারবে না।

কিন্তু এ-নিয়মের আগেই বাঙলাদেশ থেকে বাঙলা পত্রিকা বেরিয়েছে। পত্রিকার নাম—দিগদর্শন। প্রথম বাঙলা সাময়িক পত্র। মাসিকপত্র। সম্পাদক—জন ক্লার্ক মার্শম্যান। প্রথম প্রকাশকাল—এপ্রিল মাস, ১৮১৮। প্রকাশিত হ'লো শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। ঐ 'দিগদর্শন' পত্রিকার জন্মের বছর আঠারো আগেই কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে এসেছেন। কিন্তু জগৎ-সংসারে এত জায়গা থাকতে উনি শ্রীরামপুরে এলেন কেন, কেমন ক'রে এলেন? আগে ছিলেন কোথায়?

দুই

‘কলম্বস, কলম্বস।’ দিনেব পর দিন কেবল কলম্বসের গল্প। শুনে-শুনে সহপাঠীরা শেষ পর্যন্ত ঐ নিয়ে কেরীকে ঠাট্টা করতে লাগলো। ‘কলম্বস, কলম্বস।’

কেরীর বাবা এককালে তাঁত বুনেছেন। তারপর তাঁত ছেড়ে নিয়েছেন ইস্কুল-মাষ্টারি, কেরানিগিরি।

বাবার টাকাকড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়। অতএব, বারো বছর বয়সেই কেরীকে নামতে হ’লো পয়সা রোজগারের চেষ্টায়। প্রথম বছর দুই চাষ-বাসের চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু রোদ কেরীর একেবারেই অসহ্য। ও-দিক ছাড়তে হ’লো। তারপর এলো ক্লার্ক নিকল্‌সের জুতোর দোকানে। চার বছর কেরী সেখানে জুতো সেলাইয়ের কাজে শিক্ষানবীশ হ’য়ে কাটালো। শুধু জুতো সেলাই নয়, প্রত্যেক রোববার কেরী সটান চ’লে যেতো পলার্সপ্যুরি। গ্রীক ভাষা শিখতো টমাস জোন্সের কাছে। এর কাছেই ল্যাটিনের পাঠ নিয়েছিলো কেরী।

জুতোর দোকান হ’লে কি হবে, ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে ধর্মগ্রন্থও ছিলো খানকয়েক। সেগুলোও কেরী মন দিয়ে পড়তো।

তারপর একদিন ক্লার্ক নিকল্‌স মারা গেলেন। নিকল্‌সের একজন আত্মীয় টি. ওল্ড। তারও জুতোর দোকান। নিকল্‌সের দোকান ছেড়ে টি. ওল্ডের দোকানে চ’লে এলো কেরী। জুতো সেলাইয়ের শিক্ষানবীশ !

টি. ওল্ডের নানা গুণ। মদে তিনি টই-টুম্বুর; মেজাজ তার তিরিক্ষি; তার ওপর আবার ধর্মের বাতিক আছে। ধর্ম নিয়ে কেরীর সঙ্গে ভদ্রলোকের ঘন-ঘন তর্ক-বিতর্ক হ'তে লাগলো।

তা হোক, কিন্তু তর্কে হারলে তো চলবে না। কেরী তাই ধর্মগ্রন্থ পড়তে লাগলো গভীর ক'রে, আরো বেশি ক'রে মন দিলো ল্যাটিনে, গ্রীকে, হিব্রুতে। এদিকে ধর্মচর্চা; ওদিকে কিন্তু সঙ্গদোষে কেরীর চরিত্র……! কিন্তু সেসব কথা ঘাটাঘাটি ক'রে লাভ কী।

কুড়ি বছর বয়সে কেরীর বিয়ে হ'লো। পাত্রী—সেই ওল্ড সাহেবের শ্যালিকা ডরোথি প্ল্যাকেট। কেরীর স্ত্রী কিন্তু যাকে বলে নিরক্ষরা।

১৭৮৬ সাল। একটা অবৈতনিক পাঠশালার মাষ্টারি নিয়ে কেরী চ'লে এলেন মুল্টনে। জুতো-সেলাই তখনও চলছে।

ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়বার পর থেকেই কেরীর মাথায় চাপলো বিষম দুশ্চিন্তা। পৃথিবীর অখ্রীষ্টান 'হিদেনদের' কেমন ক'রে মুক্তি হবে। তাদের যে অনন্ত নিগ্রহ। ভারি দুঃখের কথা।

নিজের হাতে পৃথিবীর একখানা মস্ত ম্যাপ বানালেন, দেয়ালে টাঙালেন। সেদিকে তাকিয়ে অখণ্ড মনোযোগে ভাবতে লাগলেন, অনন্ত নিগ্রহদশা থেকে কেমন ক'রে 'হিদেনদের' উদ্ধার করা যায়।

১৭৮৯ সাল। হার্ভি লেন। শহর লিষ্টার। জুতো সেলাই করেন না, মাষ্টারিও না। কেরী পাদ্রি।

তারপর যবনিকা তুলি একেবারে ১৩ জুন, ১৭৯৩ সাল।

জাহাজ। সমুদ্র। ব্যাপটিষ্ট মিশনারি সমিতির পক্ষ থেকে জন টমাসের সঙ্গী হ'য়ে কেরী সপরিবারে যাত্রা করেছেন বাঙলাদেশের দিকে। উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টধর্ম প্রচার।

সমুদ্র। জাহাজ। কিন্তু কেরীর কি তখন ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছিলো। সেই—'কলম্বস, কলম্বস'?

এর আগে টমাস দু'বার বাঙলাদেশ ঘুরে গেছেন। বাঙলা ও বাঙালী সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। উচ্চারণ যদিও ভুল, কিন্তু তা নিয়েই টমাস বাঙলায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন। জাহাজে কেরী তাঁর কাছে বাঙলা শিখতে আরম্ভ করলেন।

কলকাতায় জাহাজঘাটে নেমেই রামরাম বসুর সঙ্গে কেরীর পরিচয় হ'য়ে গেলো। রামরাম টমাসের মুন্‌সী। সেদিনই ঠিক হ'লো, রামরাম বসু কেরীর মুন্‌সী হবেন। বেতন মাসিক কুড়ি টাকা।

কিন্তু কলকাতায় বুঝি আর থাকা চলে না। খরচ চলে না, টাকাকড়ির অভাব। টমাস আর কেরী দু'জনেই ইদিকউদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। অভাব-অনটনের সঙ্গে আবার আরেক বিপদ, কেরীর স্ত্রী অর্ধোন্মাদ হ'য়ে গেলেন এই সময়ে।

শেষকালে দু'জনেই কাজ পেলেন নীলকুঠিতে। মহীপাল-দীঘির নীলকুঠিতে টমাস আর মদনাবাটীর নীলকুঠিতে কেরী। এক কুঠি থেকে আরেক কুঠির পথ কয়েক ক্রোশ মাত্র। কেরীর সঙ্গে রামরামও মদনাবাটী এলেন।

যাক, একটা কিনারা হ'লো। এবার আসল কাজ। রামরামের সহায়তায় বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ আরম্ভ করলেন কেরী।

একদিন মহীপালদীঘি থেকে একখানা পত্র এলো মদনাবাটীতে। টমাস কেরীকে লিখেছেন। লোকমুখে টমাস শুনতে পেয়েছেন যে রামরাম বসু একটি তরুণী বিধবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। যথানিয়মে ঐ তরুণী বিধবার গর্ভে একটি সন্তান জন্মেছিলো। সেই নবজাতশিশুটিকে নাকি হত্যা করা হয়েছে গোপনে।

রামরাম বসুকে দু'জন সাহেবই বিশ্বাস কবতেন চরিত্রবান ব'লে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে সব খবরই বেরিয়ে পড়লো। মনে দুঃখ লাগলো খুব। কিন্তু এ-ব্যাপারের পরে আর উপায় কী। কেরী বাধ্য হয়ে রামরামকে বিতাড়িত করলেন।

একজন যায়, আরেকজন আসে। একজন উৎসাহী যুবক এলো—জন ফাউণ্টেন। কেরীর সহকারী। অল্প সময়ের মধ্যে ফাউণ্টেন বাঙলা শিখে নিলো। নতুন উদ্যমে কেরী আবার বাইবেলের বাঙলা কবতে বসলেন। ফাউণ্টেন সাহায্য করছে।

পুরোপুরি নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ হ'লো। এখন ছাপার ব্যবস্থা। দশহাজার কপি ছাপতে, হিসেব হ'লো, ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ। অতো টাকা কোথায় ?

ইংল্যাণ্ডে সমিতির কাছে চিঠি লিখলেন কেরী। মেসিন চাই, মেসিনম্যান চাই, টাইপ চাই।

চিঠি লিখেই নিশ্চেষ্ট থাকেন নি, কেরী নিজে এসেছিলেন কলকাতায়। নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে ছ'শো পৃষ্ঠা হবে, নতুন টাইপ কাটিয়ে ছেপে দিতে খরচ পড়বে ধরুন হাজার চল্লিশেক টাকা। অতো টাকা কোথায় ?

হিসেব শুনে আবাব মদনাবাটী চ'লে এলেন কেরী। এদিকে সমিতিও কিছু ব্যবস্থা করতে পাবলো না।

নীলের অবস্থাও খারাপ, পর-পর তিন বছর কুঠি প্রায় অচল। কেরীর মালিকের নাম জর্জ উড্‌নি। কেরীর দুর্গতির কথা ভেবেই উড্‌নি ঠিক করলেন, চলুক, কুঠির কাজ আরো দু'এক বছর চলুক।

উড্‌নি সাহেব বিজ্ঞাপন দেখলেন, কাঠের একটা ছাপামেসিন কলকাতায় নীলামে বিক্রী হবে। মেসিনটা সদ্য-সদ্য এসেছে ইংল্যাণ্ড

থেকে। কেরী বাইবেলের বাঙলা ছাপবে, না? উড্‌নি সাহেব মেসিনটা কিনলেন। কেরীকে দিয়ে দিলেন।

আগেই খবর পেয়েছিলেন কেরী, কলকাতায় দিশী ভাষায় টাইপ তৈরির একটা কারখানা খুলেছে। মেসিন যখন হ'লো, তখন আর কি। টাইপের অর্ডার দেবার জন্যে কলকাতা গেলেন কেরী।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে পেলেন একটা দুঃসংবাদ। আদেশ এসেছে, মদনাবাটী নীলকুঠির কাজ বন্ধ।

তাহ'লে কি তীরের কাছে এসে ভরাডুবি হবে? যা হবার তা তো হবেই, কিন্তু এখন কর্তব্য কী?

আর কি, এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় ক'রে কেরী উড্‌নি সাহেবের থেকে একটা নীলকুঠি কিনে নিলেন। খিদিরপুরে। সেখানে চ'লে এলেন কেরী। সঙ্গে সেই কাঠের ছাপামেসিনটিও আছে, সেই ফাউণ্টেন সাহেবটিও আছে।

ওদিকে আবার আরেক কাণ্ড, মার্শম্যান ওয়ার্ড ব্রান্সডন গ্রাণ্ট প্রভৃতি মিশনারিদের কলকাতা আশ্রয় দিলো না। তাঁরা গিয়ে নামলেন ডেনিশ-এলাকায়, শ্রীরামপুরে। এখন কেমন ক'রে কোন পথে কাজ চলবে? কেরীর মতামত কী? মিশনের ব্যবস্থা কী রকম হবে?

তিন সপ্তাহ ভাবলেন কেরী। তাঁর নিজের কথা ভাবলেন, মিশনের কথা ভাবলেন। ভেবে-চিন্তেই পরিত্যাগ করলেন এতদিনের সঞ্চয় উজাড় ক'রে কেনা খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি। কাঠের ছাপা-মেসিনটি সঙ্গে চললো। নৌকো ছাড়লো।

শ্রীরামপুরে যেদিন কেরী এসে পৌঁছলেন, সেদিন জানুআরি মাসের ১০ তারিখ, ১৮০০ সাল।

১১ জানুআরি থেকে আরম্ভ হ'লো মিশনের কাজ। সেই কাঠের ছাপা-মেসিনটা সসম্মানে রইলো মিশন-বাড়ির এক ঘরে। কেরীর বড়ো ছেলে ফেলিক্স, ওয়ার্ড আর ব্রান্সডন উঠে-প'ড়ে লাগলো ছাপাখানা নিয়ে। নিউ টেষ্টামেণ্টের ম্যাথু-লিখিত সমাচার কম্পোজ আরম্ভ হ'য়ে গেলো। কলকাতা থেকে কিনে-আনা টাইপ সাজিয়ে কম্পোজ করে চারজন কম্পোজিটর। তিনজন বিদেশী—ফেলিক্স, ওয়ার্ড আর ব্রান্সডন। আর, একজন এ-দেশী। কপি আর প্রুফ? সব কেরী দেখেন।

পঞ্চানন কর্মকার কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় চ'লে এলেন মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। পঞ্চানন বাঙলা টাইপের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ছাপাখানা একেবারে পুরোদমে চলছে।

মে-মাসের শেষাশেষি আবার এলেন রামরাম বসু। যোগ দিলেন মিশনারি গোষ্ঠীতে। কেরী তাঁর জন্যে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। বসুমশায়ের মতো গুণীজনকে এখন মিশনারিদের দরকার। সন্দেহ কি, বসুমশায়ের সাহায্য পেলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজ আরো অনেক তাড়াতাড়ি এগোবে।

সত্যি-সত্যি এগোলো। রামরাম বসু খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক গান লিখেছেন, অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেগুলো প্রচারিত হয়েছে বহুল পরিমাণে। আর তারই প্রত্যক্ষ ফল বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ফলেছে ডিসেম্বর মাসে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম যে-বাঙালী আপন ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টান হ'লো, তার নাম কৃষ্ণ পাল। একজন ছুতার!

রামরাম বসু কিন্তু খ্রীষ্ট-মহিমা প্রচারের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করেছেন। কেরীর অনুরোধে খ্রীষ্টতত্ত্বের স্বপক্ষে তো বটেই,

সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও পুস্তিকা লিখে দিয়েছেন রামরাম। তাঁর আচার-ব্যবহার দেখে কেরীর ধারণা হয়েছিলো যে রামরাম শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান হবেন। কিন্তু ভুল ধারণা। রামরাম কোনোদিন স্বধর্ম ছাড়েন নি।

যাক, যে-কথা হচ্ছিলো। নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই কেরীর কাছে একটা প্রস্তাব এলো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে কেরী গ্রহণ করলেন সেই প্রস্তাব।

তারপর থেকে কেরী আর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদরি নন। কেরী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা ভাষার অধ্যাপক।

বাঙলার জন্যে এসেছিলেন, কিন্তু আস্তে-আস্তে কলেজে আরো কাজ বাড়লো কেরীর। তিনি বাঙলা পড়ান, সংস্কৃত পড়ান, মারাঠীও পড়ান।

প্রতিটি দিন একেবারে অলঙ্ঘ্য নিয়মে বাঁধা।

সকাল পৌনে ছটায় ঘুম ভাঙে। হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পড়া আর উপাসনা করা ঘড়িতে সাতটা বেজে যায়। তারপর সপরিবারে বাঙলায় উপাসনা। অতঃপর মুনশীর সঙ্গে ফারসী পাঠ। প্রাতরাশ। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে নিয়ে রামায়ণ অনুবাদ। তারপর কলেজ—দুটো পর্যন্ত।

কলেজ থেকে ফিরে এসে কেরী বসতেন গাদা-গাদা প্রুফ নিয়ে। সন্ধ্যে হ'য়ে যেতো। আহারান্তে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় করতেন বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ। এক অধ্যায় শেষ ক'রে তারপর পাঠ নিতেন তেলিঙ্গা পণ্ডিতের কাছে। রাত নটা; একা-একা কেরী করতেন বাঙলা অনুবাদ। রাত এগারোটায় এক অধ্যায় গ্রীক বাইবেল পড়তেন। একটি পরিপূর্ণ দিন শেষ হ'লো শয্যা।

কেরী রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থসংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

'ইতিহাসমালা'—কেরী-কৃত একখানা সঙ্কলন। নানা বিষয়ের দেড়শো গল্প আছে বইখানায়। শেষ গল্পটির শেষে আছে ভারি সুন্দর কয়েকটি লাইন: মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবেশীকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে···।

আর 'কথোপকথনে'র রচনাগুলি সেকালের চল্‌তি ভাষা আর ইডিয়মের উজ্জ্বল উদাহরণ। একটু নমুনা:

পর দিবস সাহেব প্রাতে উঠিয়া হুকুম করিলেন।

খেদমতগার চিলম্‌চি ও পাত্র করিয়া জল আন। মুখ ধুইব।

সাহেব জল প্রস্তুত মুখ ধুন।

নাপিতকে ডাকহ ক্ষৌর হইব।

সাহেব নাপিত আসিয়াছে হাজামত হউন।

নাপিত কোথায় আমি চুল বন্ধাইব।

সাহেব এই যে আমি হাজির আছি।

বেহারা ধোপ বস্ত্র আনহ আমি কাপড় বদলাইব।

সারথিকে হুকুম দেহ। গাড়ি তৈয়ার করুক। আমি বেড়াইতে যাইব।

সারথি গাড়ি শীঘ্র তৈয়ার কর।

কোন গাড়ি তৈয়ার করিব চারি ঘোড়ার কি দুই ঘোড়ার।

চারি ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া যোড়।

বাঙলা ভাষাকে কেরীই প্রথম দিয়েছেন মর্যাদা। বাঙলা ভাষাকে কেরী ভালোবেসেছিলেন সর্বান্তঃকরণে। বাঙলায় এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে। সে-লক্ষ্যের জন্য নয়, চিরকালের বাঙালীর কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হ'য়ে রইলেন তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য।

একবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, কলেজ থেকে বাঙলা-পাঠ তুলে দেবেন। কেন? না, কলেজের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। এ-বিষয়ে মতামত চাওয়া হ'লো কেরীর কাছে।

জবাবে কেরী যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার এক জায়গায় আছে –The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none…

এই হ'লো গিয়ে বাঙলা ভাষার প্রতি কেরীর বিশ্বাস ও মনোভাব। আর, কেরীর কল্যাণেই বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম। এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই কেরীর অধীনে মাসিক দুশো টাকা বেতনে বাঙলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের কাজ পেয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

তিন

মৃত্যুঞ্জয় বাঙলাসাহিত্যের একজন প্রধান পুরুষ।

রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ সালে। তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়ের গদ্যগ্রন্থ। আর সকলের চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থসংখ্যা বেশি।

গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত তিনি, কিন্তু ১৮১৭ সালে দেখি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় মত জানিয়েছেন সহমরণের বিপক্ষে। মৃত্যুঞ্জয়ের সেই মতকেই রামমোহন প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতি করেছেন, সুপ্রীমকোর্টে পণ্ডিতি করেছেন। সেকালে সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা করা একটা সম্মানের বিষয়। অমুকের দু-তিনটি মোকদ্দমা চলছে সুপ্রীমকোর্টে। তাহলে অমুক অবশ্যই একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সুপ্রীমকোর্টে দু-তিনটি মোকদ্দমা চালিয়ে যে-সম্মান পাওয়া যায়, দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা খরচ করলেও সেরকম হবার কথা নয়।

ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কার সাধ্য সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা চালায়?

কিন্তু সুপ্রীমকোর্টে মামলা-মোকদ্দমা চালিয়ে ফললাভ কী হয়

দেখি। মৃত্যুঞ্জয় তো ওসব অনেক দেখেছেন, তিনি বলতেন—ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রীমকোর্টে এসেছেন, তাঁরা একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে সেই আদালত থেকে বেরিয়েছেন, এছাড়া আর কিছু দেখিনি।

কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়েছিলেন তীর্থ-ভ্রমণে। নানা তীর্থদর্শনের পর বাড়ি ফেরার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগেই শ্রীরামপুরে জন্ম হয়েছে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার। প্রথম সংখ্যার তারিখ ১৮১৮ সালের ২৩মে। সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান। সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রত্যেক শনিবার শ্রীরামপুর থেকে বেরোতো। প্রথম তিন সপ্তাহ বিলি করা হয়েছিলো বিনামূল্যে। সম্পাদক একজন সাহেব, কিন্তু আসল কাজ করতেন দিশী পণ্ডিতেরা। তাঁরা যদি উপস্থিত না থাকতেন তো পত্রিকায় নতুন সংবাদও নেই। পণ্ডিতেরা বাড়ি গেছেন তো পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবেদন দেখা গেলো—আমারদের পণ্ডিতগণ আগামী সোমবার পর্য্যন্ত স্ব ২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন ২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

১৮৩২ সালেব ১১ জানুয়ারি থেকে আরেকটু উন্নতি হ'লো পত্রিকাটির। ছিলো সাপ্তাহিক, হ'লো অর্ধ-সাপ্তাহিক। ১৮৩৪ সালের ৮-নভেম্বর থেকে আবার পালা বদল হ'লো। আবার যেই সাপ্তাহিক সেই সাপ্তাহিক, সেই প্রতি শনিবারের পালা।

১৮৪০ সালের জুলাই মাস থেকে মার্শম্যান সাহেবের ওপর 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' নামে আরেকখানা পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পড়লো। কাজের চাপ বেড়ে গেলো, তাই মার্শম্যান সাহেব ১৮৪১ সালের শেষের দিকে 'সমাচার দর্পণ' ছেড়ে দিলেন।

সাহেবেরা ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীরা ছাড়লেন না। তাদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' আবার প্রকাশিত হ'লো ১৮৪২ সালে। এবার সম্পাদক একজন বাঙালী—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি পত্রিকাখানা। ১৮৪৩ সালে আবার বন্ধ হ'লো 'সমাচার দর্পণ'। কিন্তু ১৮৫১ সালের মে-মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে আবার প্রকাশিত হ'লো 'সমাচার দর্পণ'। দেড় বছর বাদে বন্ধ হ'লো। সেই শেষ।

শ্রীরামপুর থেকে 'সমাচার দর্পণ' আর কলকাতা থেকে 'বাঙ্গাল গেজেট'। 'সমাচার দর্পণে'র মূলে ছিলেন সাহেব, আর 'বাঙ্গাল গেজেটি'র মূলে বাঙালী। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙালীদের হাতে গড়া প্রথম বাঙলা পত্রিকা। মূলে ছিলেন দু-জন - গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আর হরচন্দ্র রায়।

'সমাচার দর্পণ' আর 'বাঙ্গাল গেজেটি' দুয়ের মধ্যে বয়সের তফাৎ মাত্র কয়েকটি দিন। দুটি পত্রিকার জন্ম একই বছরে—১৮১৮ সালে।

১৮২১ সাল। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্র দেখে রামমোহন রায় বিবেচনা করলেন মিশনারিদের পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মকে অযথা আক্রমণ করা হয়েছে। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে উত্তর লিখে তিনি 'সমাচার দর্পণের' সম্পাদকের কাছে পাঠালেন। সম্পাদক মশাই সে-উত্তরটি পুরোপুরি ছাপতে রাজি হলেন না। রামমোহন রায় তখন বের করলেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'শিবপ্রসাদ শর্মা'র নামে রামমোহন একাধিক রচনা ছাপিয়েছেন ঐ পত্রিকায়।

সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেছেন কলুটোলার তারাচাঁদ দত্ত আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশদিন—৪-ডিসেম্বর, ১৮২১। প্রতি মঙ্গলবারে বেরোতো 'সম্বাদ কৌমুদী'।

অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন রামমোহন রায়। সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন তাই তেরোটি সংখ্যা বেরোনোর পরেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না। তা নয় তো 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভবানীচরণ কি সহমরণ তথা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করবেন, সমাজে পতিত হবেন? ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত। নামে হরিহর কিন্তু কাজে পত্রিকা চালাতে লাগলেন রামমোহন। পত্রিকার টাকা-পয়সার অবস্থা কিছু আশাপ্রদ নয়। তাই হরিহরও সত্ত্বাধিকারীর পদ থেকে আড়াইমাস বাদেই অবসর নিলেন। তার বদলে পরিচালক হলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। তবুও চললো না, চারমাস পরেই বন্ধ হ'য়ে গেলো 'সম্বাদ কৌমুদী'। পরের বছর এপ্রিল মাসে পুনর্জীবিত হ'লো 'সম্বাদ কৌমুদী'। সেবার সম্পাদক—আহিরীটোলার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুদ্রাকর ও প্রকাশক আগের সেই গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পত্রিকাটি তখন থেকে প্রায় দশ বছর জীবন্ত

১৮২২ সালে কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি থেকে বেরোলো 'পশ্বাবলী' নামে একখানি মাসিক বাঙলা বই। একেকটি সংখ্যায় একেকটি জন্তুর কথা ও কাহিনী, সঙ্গে সেই জন্তুটিরই কাঠ-খোদাই ছবি। যথা—সিংহ, ভালুক, হাতি, গণ্ডার ইত্যাদি। সংকলয়িতা ছিলেন পাদরি লসন, কাঠখোদাইগুলিও তাঁর। রচনার বঙ্গানুবাদ ক'রে দিতেন পীয়ার্স সাহেব। পাদরি লসনের মৃত্যুতেই 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্যায় শেষ হ'লো। দ্বিতীয় পর্যায়েও 'পশ্বাবলী' বেরিয়েছিলো রামচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায়। সাকুল্যে ষোলোটি সংখ্যা বের

করেছিলেন তিনি। প্রথম পর্যায়ের 'পশ্বাবলী' থেকে রচনার একটি দৃষ্টান্ত দিই। রচনাটি শৃগাল-সংক্রান্ত।

'জেলা নদিয়ার মাটিয়ারি পরগণাব সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল; সে প্রতিদিন রোজা করিত; তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত. শৃগালেরদিগকেও অন্ন দিত, ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেইস্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাকারম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত; পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহারদিগকে অন্ন দিত. তাহাতে শৃগালেরা আপন ২ ভাগ খাইয়া অন্য কোন ভাগের উপর আক্রমণ করিত না. আর শৃগালেরা ঐ বিশ্বাসের নিকটে অতি নির্ভয়ে আপন ২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত, এবং তাহারদিগকে ভাগ ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে; আজ্ঞা পাইলে স্ব ২ ভাগ মাত্র খায়.

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে, বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক বোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোক দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালেরদিগকে নিয়মানুসারে দিল; তাহাতে প্রভুর দুঃখে কোন শৃগাল সে দিন অন্ন খাইল না.

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাশী হইয়াও অন্য ২ বালকের গোরের মত তাহার কোন ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল. ইহাতে হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমারদিগেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত.'

ওদিকে সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন একের পর আরেক প্রবন্ধ রচনা ক'রে চলেছেন 'সম্বাদ কৌমুদী'তে। সেজন্যেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করেছেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সেটুকুই তো যথেষ্ট নয়। গোঁড়া হিন্দুরা—যারা সহমরণের পক্ষে -একখানা সাপ্তাহিক পত্র বের করলেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা'। সম্পাদক—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি প্রকাশিত হ'লো ৫-মার্চ, ১৮২২ সাল। 'সম্বাদ কৌমুদী' আর 'সমাচার চন্দ্রিকা'—একখানা আরেকখানার বিষম বিপক্ষ। দু-দলে বিবাদ। দু-পত্রিকাই অসাধুভাষায় একে অন্যের নিন্দা ছড়াতে লাগলো। শেষকালে ১৮২৯ সালের এপ্রিলমাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' আর সাপ্তাহিক রইলো না, সপ্তাহে দু-বার ক'রে বেরোতে লাগলো। সেসময়ে খুব নাম-ডাক হয়েছিলো 'সমাচার চন্দ্রিকা'র, অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় গ্রাহকসংখ্যাও ছিলো চমৎকার। ১৮৪৮ সালের ২০-ফেব্রুআরি ভবানীচরণ মারা গেলেন। তারপর 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক হলেন তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ। কিন্তু তখন 'সংবাদ প্রভাকর' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকার আবির্ভাবের ফলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আর সেদিন নেই। রাজকৃষ্ণবাবু ঋণভারে দেউলে হ'য়ে গেলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব কিনে নিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই স্বত্বের ব্যাপারেও গোলমাল গড়িয়েছিলো অনেকদূর। এমন কি, উকিলের চিঠি পর্যন্ত ছাড়া হয়েছিলো।

সাময়িক পত্র সম্পর্কে নতুন আইন জারি হ'লো ১৮২৩ সালে। সেই আইনের ফলে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর আর প্রকাশককে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হ'তো। ১৮৩৫ সালে স্যর চার্লস মেটকাফের কৃপায় ও-আইন রদ হ'য়ে গেলো।

পাথুরেঘাটা থেকে একদিন সরকারের দপ্তরে একখানা আবেদনপত্র এসে উপস্থিত। একখানি বাঙলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের অনুমতির জন্যে আবেদন। আবেদনপত্রটির ভাষা ইংরেজি কিন্তু পত্রের নিচে স্বাক্ষরটি বাঙলা। স্বাক্ষর করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সাপ্তাহিক পত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলো 'সংবাদ প্রভাকর'। পরবর্তীকালে এই 'সংবাদ প্রভাকর'ই দৈনিকপত্র হয়েছিলো। এই 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাঙলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিকপত্র।

২৬-জানুআরি, ১৮৩১। সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম সংখ্যা বেরোলো। গোড়ার দিকে পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের টাকায় চোরবাগানের একটি প্রেসে ছাপানো হ'তো 'সংবাদ প্রভাকর'। মাসকয়েক পরে ঐ 'সংবাদ প্রভাকর' ছাপানোর জন্যে ঠাকুরবাড়িতে একটি প্রেস বসানো হ'লো।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পরে দেড় বৎসরাবধি অপ্রকাশিত ছিলো 'সংবাদ প্রভাকর'। এই পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হ'লেও বাধাবিঘ্নহীন নয়। সাপ্তাহিক ছেড়ে পত্রিকাটি বারত্রয়িক হয়েছে, বারত্রয়িক থেকে দৈনিক।

আরেকখানি পত্রিকা —'জ্ঞানান্বেষণ'। এর মূলে ছিলো ইংরেজি-জানা উদারমতাবলম্বী যুবকদের উদ্যম। গবর্নমেণ্টের লাইসেন্স নিয়ে প্রথম এই সাপ্তাহিকখানা প্রকাশ করেন দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণানন্দনের পরে 'জ্ঞানান্বেষণে'র পরিচালনার ভার নিলেন রসিককৃষ্ণ ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। প্রথমদিকে 'জ্ঞানান্বেষণ' বেরোতো বাঙলা-ভাষায়, তারপর ইংরেজি-বাঙলা দু-ভাষাতেই প্রচারিত হ'তে লাগলো 'জ্ঞানান্বেষণ'।

কিছুকাল এই পত্রিকার বাঙলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। উদারমতাবলম্বী—এই অপরাধে তিনি সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের কাছে বহুনিন্দিত। 'জ্ঞানান্বেষণ'কে কেন্দ্র ক'রে দক্ষিণানন্দন ও গৌরীশঙ্করকে জড়িয়ে গোঁড়াদলের একজন—'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক—একবার লিখলেন: সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৮৩৫ সালের জুনমাসে। প্রথমদিকে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ছিলো মাসিক পত্রিকা, প্রত্যেক পূর্ণিমায় বেরোতো। প্রথমে তিনবছরের অধিককাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হরচন্দ্রের পরে সম্পাদক হলেন আমড়াতলার উদয়চন্দ্র আঢ্য। তারপরের সম্পাদক উদয়চন্দ্রের বড় ভাই অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। অদ্বৈতচন্দ্রের পর গোবিন্দচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রের পর মহেন্দ্রনাথ।

১৮৩৬ সালের ৯-এপ্রিল থেকে মাসিক ছেড়ে সাপ্তাহিকপত্র হ'লো 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'। তারপর ১৮৪৪ সালের নভেম্বর থেকে একেবারে দৈনিকপত্র। ঐ দৈনিকপত্র হিসেবেই দীর্ঘ তিয়াত্তর বছর চলেছে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'।

তারপর বলা যাক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার কথা।

মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' বেরিয়েছিলো। সম্পাদক—শ্রীনাথ রায়। কিন্তু মূলে পরিচালক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। তা এসব হ'লো গিয়ে ১৮৩৯ সালের কথা।

তারপর পুরোপুরি এক বছরও কাটেনি, জানুয়ারি মাসের এক সকালবেলা। আটটা নাগাদ হবে তখন, শ্রীনাথ রায় পটল-ডাঙার চৌমাথার কাছে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, বলাকওয়া নেই অস্ত্রশস্ত্রসমেত কয়েকজন তাকে ধ'রে সুরু করলো বেদম প্রহার। জোর ক'রে শ্রীনাথ রায়কে ধ'রে নিয়ে গেলো। আন্দুলে।

আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়। তিনিই সর্বকাণ্ডের ঘটক।

গোড়া থেকেই বলি তাহলে ব্যাপারটা।

কিছুদিন আগে শ্রীনাথ রায়ের কাছে একখানা চিঠি এসেছিলো। তাতে ছিলো আন্দুল-রাজবংশের বিরুদ্ধে বিস্তর কুকর্মের অভিযোগ; দু-জন ব্রাহ্মণকে রাজা ধর্মসভা থেকে বের ক'রে দিয়েছেন; বৈষ্ণবের মেয়ের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণের বিয়ে দেওয়া নিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি রাজা বল প্রকাশ করেছেন ইত্যাদি অভিযোগ।

কিন্তু শ্রীনাথ রায় সে-চিঠি প্রকাশ করেননি। শ্রীনাথ রায় শুধু বলেছেন—রাজার এসব কর্ম করা অনুচিত।

তাতেই রাজা মশায়ের উষ্মা হয়েছে। রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন—ঐ শ্রীনাথকে মারপিট ক'রে ধ'রে নিয়ে এসো।

হুকুমের চাকরেরা হুকুম তামিল করেছে। মারপিট ক'রে শ্রীনাথ রায়কে আন্দুল পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

আন্দুলে অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন—রাজার সামনেই রাজার দূতেরা শ্রীনাথ রায়ের গায়ে বিছুটি লাগাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় শ্রীনাথ রায় চিৎকার করছেন।

রাজার নামে নালিশ উঠলো। সুপ্রীম কোর্টে। পরোয়ানা বেরোলো। অবিলম্বে শ্রীনাথ রায়কে আদালতে উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু কোথায় কী। আদালতের অবমাননা ক'রে রাজামশাই গা-ঢাকা দিলেন। আর শ্রীনাথ রায়কে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাখলেন এখানে-ওখানে। কিন্তু ঢেকে-লুকিয়ে আর কদিন চলে। এদিকে আবার আদালতের হুকুম। রাজার নামে নালিশ! অনেক নাকি বোঝানো হয়েছে তখন শ্রীনাথ রায়কে, অনেক টাকার লোভ দেখানো হয়েছে। যদি আদালতের হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলা যায়!

মিটমাট কিসের, এদিকে শ্রীনাথ রায়ের সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদ প্রভাকরে' একখানা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছেন। রাজাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পাঁচশো টাকা পুরস্কার!

বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারেননি রাজামশাই, ধরা পড়লেন। প্রথম কিছুদিন হাজত-বাস হ'লো, দিতে হ'লো হাজার টাকা জরিমানাও। মোকদ্দমার পর শ্রীনাথ রায় আবার 'সম্বাদ ভাস্করে' যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারেননি। মাস কয়েক বাদেই মারা যান ভদ্রলোক।

তারপর বলা যাক 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার কথা। গালিগালাজ আর অশ্লীল রচনায় ভর্তি। তবুও কিম্বা সেজন্যেই হয়তো 'সম্বাদ রসরাজ' গরম কাটতো।

তাহলে গোড়া থেকে বলি। গোড়ায় 'সম্বাদ রসরাজ' বেরিয়েছিলো সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশের তারিখ হ'লো ২৯-নভেম্বর, ১৮৩৯। অল্পদিন বাদেই সাপ্তাহিক ছেড়ে অর্ধসাপ্তাহিক হ'লো 'সম্বাদ রসরাজ'।

প্রথমে সম্পাদক ছিলেন, কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরের সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টচার্য। তারপর ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেসব কথা থাক।

নাম কালীকান্তের, কিন্তু আসলে পরিচালনা করতেন গৌরীশঙ্কর। 'সম্বাদ ভাস্কর' আর 'সম্বাদ রসরাজ'—এই দুই পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছিলো অভিন্ন।

পয়লা সম্পাদকীয় হাঙ্গামার খবরটা বলি।

কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ আর তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কুৎসা বেরোলো 'সম্বাদ রসরাজে'। রাজা কৃষ্ণনাথ অতঃপর সুপ্রীম কোর্টে 'রসরাজের' নামে মানহানির মোকদ্দমা ঠুকে দিলেন।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন গৌরীশঙ্কর। শাস্তির বহর অনেকখানি পাঁচশো টাকা দণ্ড, ছ'মাস কারাবাস, হাজার টাকার মুচলেকা, আর পাঁচশো টাকার জামিন দাঁড়াতে হ'লো দুজনকে। আদেশ হ'লো কারামুক্তির পরেও গৌরীশঙ্কর যেন একবছরের মধ্যে রাজা কৃষ্ণনাথের নামে কোনো অপবাদ প্রকাশ না করেন।

কারাবাসী হ'য়েও গৌরীশঙ্কর পাঠকদের আশ্বাস দিলেন—এমতাবস্থায়ও উনি পাঠকবর্গের উপকারার্থ সাধ্যানুসারে পরিশ্রমের ত্রুটি রাখবেন না।

এ-দুর্ঘটনার এগারো বছর পরে—১৮৫৫ সালের কথা বলছি—আবার আরেক কুৎসা! এবার লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের নামে। আবার ছ-মাসের জন্যে কারাবাসী হলেন গৌরীশঙ্কর।

এ-বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' যা বেরিয়েছিলো, তা অংশত উদ্ধার করি :

যাঁহারা সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কি বিলাতে, কি ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তির ভাগ্যে কস্মিন্ কালে এতদ্রূপ ঘটনা হয় নাই।—আমারদিগের সম্ভ্রান্ত সহযোগী ভাস্কর সম্পাদক আপনার কার্য্য ও বিবেচনা দোষে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরের পব পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবার লইয়া দুইবার হইল, এ দণ্ড নিতান্ত লঘু দণ্ড হয় নাই···

অধুনা আমরা বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অবধি দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করুন। আর যেন অনর্থক লোকের কুৎসা ও নিন্দা লিখিয়া শত্রু বৃদ্ধি না করেন।

কিন্তু কিসের কী, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পবিবারকে লক্ষ্য ক'রে গৌরীশঙ্কর পুনরপি কলম ছোটালেন। তাই নিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড একেবারে।

রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের কাছে গৌরীশঙ্কর এককালে বিস্তর উপকার পেয়েছিলেন। সেসব দিনের কথা গৌরীশঙ্কর ভোলেননি। এবার সেই রাজা কমলকৃষ্ণ পর্যন্ত বিরূপ হলেন।

তবে আর উপায় কী। তখন একখানা বিদায়-বাণী লিখলেন গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'। তার থেকে খানিক :

আমরা এতকাল 'আমরা ২' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা ২ বলিতে পরিতের্ষ্কি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরা ২' লিখিয়াছি, যাঁহারা শঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা

সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন ; সর্ব্ব প্রকারে যাঁহার দিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ ? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল ২করিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ শঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন, এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘনিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব ? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলেব মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম...

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ 'রসরাজ' পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।

পরনিন্দা আর গালাগালির কাগজ 'সম্বাদ রসরাজ' বন্ধ হ'য়ে গেলো। পরের দিন এই নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' ছাপাব অক্ষরে নানাবাক্য বেরোলো। তার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

গত দিবসের প্রভাতকাল এই জগতের পক্ষে কি সুপ্রভাত হইয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়।...হে পাঠকগণ!--হে দেশীয় বন্ধুবর্গ!--হে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অধীন মানব-মণ্ডলি।—অদ্যাবধি আপনাবদিগের সুখের পথের কণ্টক নিবারণ হইল, আপনারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে নিরুদ্বেগে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সমাধা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।...যে এক বিষময়-বৃক্ষ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া কুফল প্রসব পূর্ব্বক এতদ্দেশস্থ সমস্ত জনের ঘোরতর উদ্বেগকর হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত আর কুঠার ধারণ করিতে হইল না, সে কর্ম্মদোষরূপ কীটের আঘাতে আপনিই সমূলে নিপাত হইল।...ভাস্কর সম্পাদক অধুনা

প্রবোধ পাইয়া ভয়েই হউক, অথবা বৈরাগ্য ধর্ম্মেই হউক, খলতা স্বভাব পরিহার পুরঃসর অনুতাপ করিয়া অতি ঘৃণিত অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অবাচ্য, পরনিন্দা ও পরানিষ্ট-পরিপূরিত কুৎসিত অপদার্থ রসহীন 'রসরাজ' পত্র প্রকাশে বিরত হইলেন। আপন হস্তেই রসরাজের গলা টিপিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? রাম রাম! রসরাজের নাম করিতে এখনো তটস্থ হইতেছি, হৃৎকম্প হইতেছে, গায়ের রক্ত জল হইয়া বলের লঘুতা হইতেছে।—যখন কেহ এমত কহিতেন, যে, ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লেখনী ধারণ পূর্ব্বক রসরাজ পত্রের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে মনে তাঁহার প্রতি কত ঘৃণা হইত। তাঁহার এই গুরুতর দোষ জন্য আমরা প্রভাকরের সহিত ভাস্কর পত্রের বিনিময় পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ তাহাতেও প্রায় সর্ব্বদাই অভিমান-ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ হয়। রসরাজ দেখা দূরে থাকুক, যাঁহারদিগের বিছানায় ঐ নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম, তাঁহারদিগের বিছানায় বসিতেও লজ্জা বোধ করিতাম। যাহা হউক, ভাস্কর মহাশয় এখন রাম বলিয়া গঙ্গাস্নান করুন, কারণ তাঁহার ঘাম দিয়া জ্বর ত্যাগ হইল…

মৃত রাজা কৃষ্ণনাথী হেঙ্গামায় যখন প্রথমবার শ্রীঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমরা হাতে ধরিয়া বিস্তর বুঝাইযাছিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছি 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষান্ত হউন, গালাগালি আর দিবেন না, অনর্থক পরদ্বেষী হইয়া কেন অকারণে জগতের শত্রু হইতেছেন?' তখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, হিত বলিয়া বিপরীত হইল, মিথ্যা করিয়া আমারদের বিরুদ্ধে অনবরতই কেবল কটু কথার বাড় ঝাড়িতে লাগিলেন…

অনন্তর 'কাট খোট্টা'র পালা লিখিয়া ঈশ্বরী প্রসাদী ঠেলায় দ্বিতীয়বার যখন চৌরঙ্গীর মাঠের শ্রীমন্দিরে ভোগের উপর নির্ভর করিয়া ঘণ্টা নিনাদ করেন, তৎকালেও আমরা অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা না শুনিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—আশ্রয়দাতা সাহায্যকারি শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর এক মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিয়া বিচার-স্থলে প্রকাশ্যরূপে আপনিই মিথ্যাবাদী ও গঙ্গাজোলে হইলেন। বিশ্বাসঘাতিতা ও খলতা করিয়া সর্ব্বাচ্ছাদক মহারাজের অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলেন, উক্ত বাবু সংপূর্ণ নির্দ্দোষী ও ধার্ম্মিক, এজন্য পুণ্যবলে শঠের ষড়যন্ত্র ঘটিত শঠতা-জালে বদ্ধ হইলেন না, ধর্ম্মই তাঁহার নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।…যাহা হউক ভট্টাচার্য্য যদি তখনো সাধুলোকের কথা শুনিতেন তবে কখনো এত অপমান ও এত লজ্জা ভোগ করিতে হইত না, তৎকালে জেলখানায় থাকিয়া কেবল একটি দিন মাত্র রসরাজকে বৈষ্ণব করিয়া পরদিন আবার যে অবতার সেই অবতার হইয়া বসিলেন। স্বভাগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, পুনরায় হাটের নেড়া হইয়া হুজুক চাহিলেন, কিন্তু এখন গলায় গলায় হইয়াছে, আর রাখিতে পারেন না, থাকিতে পারেন না, কাজে কাজেই বলিতে হইল।

'এই নেও তোমার তুল্‌সী মালা,
বম্ বম্ শাক্ত হলাম্।'

অগ্রে বলিয়াছিলেন।

'যে হাতে পূজি আমি, সোণার গন্ধেশ্বরী,
সেই হাতে পূজিব কি, কানী চ্যাংমুড়ী।'

কি করেন, ছেলে নয়, ছোঁড়া নয়, মনসার সঙ্গে বাদ, সুতরাং বাপ্‌রে, সাপ্‌রে বলিয়া জিব কাটিতে হইল।…

হে মহাশয়! দোহাই দোহাই!—আপনি এইক্ষণে সুস্থির হইলে দেশটা সুস্থির হয়, অনেকের হাড়ে বাতাস লাগে…

অপিচ রসরাজে আপনকার যৎকিঞ্চিৎ যে লাভ ছিল, সংপ্রতি সেই লাভের অভাব জন্য কখনই খেদ করিবেন না, সে লাভ লাভ নহে, ঘোরতর অলাভ, কারণ অন্যায়ার্জ্জিত ধন, ধন নহে, সে ধন কাক, কুক্কুর ও শূকরের বিষ্ঠা অপেক্ষা অতি হেয়! লোকের মিথ্যা সুখ্যাতি লিখিয়া, ভয় দেখাইয়া এবং নিন্দা করিয়া যে অর্থ, সে অর্থ অনর্থ, তাহার অপেক্ষা চৌর্য্যধন বরং ভাল। এতকাল যাহা করিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহার আর কোন উপায় নাই, এইক্ষণে কেবল ন্যায়ার্জ্জিত ধনের উপর নির্ভর করুন, ইহাতে যদি শাকান্ন খাইয়া দিনপাত করিতে হয় তাহাতেও খেদ নাই, কেননা ন্যায় এবং ধর্ম্মধন সকল ধনের সার ধন।…

পুনরায় আর যেন কুপ্রবৃত্তি না হয়, কোন দল বিশেষের অনুরোধে আবার যেন আর একখানা ঘৃণিত পত্র প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রবলতর প্রমাদ ঘটিয়া উঠিবে, কেহ আর বিশ্বাস কবিবে না, আলাপ করিবে না, এবং নামো করিবে না, আপনি রসরাজ বন্দ করিয়া বড় বিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন, রাজদ্বারে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যদিও কেহ কেহ অর্থ দ্বারা আপনাকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু দৈহিক দণ্ডের ভাগ কেহই লইতেন না, সে ভোগ কেবল আপনারি হইত, তখন 'যা শত্রু পরে পরে' এই বলিয়া সকলে কৌতুক দেখিতেন, তাঁহারা আপনাকে আস্তাবলে রাখিয়া ঘোড়ার আলাই বালাই দূর করিতেন।…

যে 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার মৃত্যু উপলক্ষে উপরের প্রস্তাব বেরিয়েছিলো, সেই 'সম্বাদ রসরাজ' কিন্তু পুনর্জীবিত

হয়েছিলো গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পরে। কিন্তু সেকথা পরে হবে।

আর যে-পত্রিকায় উপরের প্রস্তাব বেরিয়েছিলো, সে—পত্রিকার নাম 'সংবাদ প্রভাকর,' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কি 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়া আর কোনো পত্রিকা সম্পাদনা করেন নি? করেছেন। 'সংবাদ রত্নাবলী' আর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর সেই 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নিয়ে কী কাণ্ড। কিন্তু সেসব কথাও এখন নয়।

আসল কথা, 'সংবাদ প্রভাকরে'র কাছে বিস্তর পত্র-পত্রিকা ম্লান হ'য়ে গেছে। এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্রের অদ্বিতীয় কীর্তি।

এমন একাধিক ব্যক্তির নাম করা চলে, যারা এককালে ঐ প্রভাকরে শিক্ষানবিশী করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যে দিকপতির সম্মান পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রভাকরের মধ্যবর্তিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরেই প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরের কাছে আপন ঋণের কথা স্বীকার ক'রে গেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কথা ব্যক্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মুখেই কিছু কিছু ঈশ্বরকথা শোনা যাক।

চার

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র।...

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিলেন না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজমধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কুঠিতে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচড়াপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কে রে ? - কে যায় ?"

"আমি ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস ?"

"ঠাকুরমশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম হোগলকুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা !

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময় তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরা-পাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু।...এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে-- তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, একগাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবি প্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল--বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক

ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠামহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই- মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন।...

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়ায় বড় মন দিলেন না।...

কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময় মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন।...

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা

সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।...

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজকাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল্ রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয় –রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষাব অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়াশুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয় – মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত

ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইহারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম ?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষ শূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে —এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতি শীলের গল্প শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড়মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি —সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।…

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই

ঠাকুরবাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থানপূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখাপড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুরবাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে- কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তিপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন

ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি, আধুনিক বর-কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণপোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গমণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা

প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না।…

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তেব জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুরবাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিবিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালনভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত।…

ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহাব স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া অনুজ বামচন্দ্রেব সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু মাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্রভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত সে-ই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি সংকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন; মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে-কোন শ্রেণীর যে-কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে-কোন সময়ে তাঁহাকে যে-কোন প্রকার কবিতা গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।······

তিনি সুরাপান করিতেন, এ জন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন।···

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া

তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।'

কিন্তু বাঙলা সাময়িক পত্রের প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পাশাপাশি আরেক ব্যক্তির নাম না নিলে অন্যায় হয়। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভটচায।

স্বনামধন্য দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন গৌরীশঙ্কর। বর্ধমানের রাণী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান থেকে কলকাতায় এনে বিয়ে করেন দক্ষিণা-নন্দন। সিভিল ম্যারেজ। সেই সিভিল ম্যারেজে সাক্ষী ছিলেন গৌরীশঙ্কর।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গৌরীশঙ্করের থেকে বারো বছরের ছোটো। প্রথম থেকে শেষ অবধি উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিলো বললে নির্ভুল হবে না। মধ্যিখানে এক সময়ে তুমুল বিবাদ হয় উভয়ের মধ্যে। তার সাক্ষ্য আছে সেসময়ের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও 'সম্বাদ রসবাজ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। দুজনেই ব্যবহার করেছেন অশ্লীল কথা, কদর্য ভাষা। কতো কুৎসা, কতো গ্লানি। পরিশেষে সেই কুশ্রী প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

কিন্তু দুজনের মধ্যে সেই বিবাদ ও কুশ্রীতার সম্পর্কই কি বজায় ছিলো শেষ পর্যন্ত ? না, ছিলো না। পরবর্তীকালে আবার উভয়ের মধ্যে ফিরে এসেছিলো সেই পুরোনো সৌহার্দ্য, সেই চিরনতুন বন্ধুত্ব, সেই মাধুর্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয়, গৌরীশঙ্কর তখন মৃত্যুশয্যায়। সেই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গৌরীশঙ্কর 'ভাস্কর' পত্রিকায় প্রশ্নোত্তর ছলে লিখেছিলেন :

প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।

'যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে···।' এই আশঙ্কাই সত্য হ'লো। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই লোকান্তরিত হলেন গৌরীশঙ্কর।

আগেই বলা হয়েছে, গৌরীশঙ্কর নিজেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন 'সম্বাদ রসরাজ'। ৫-ফেব্রুআরি, ১৮৫৯—গৌরীশঙ্করের মৃত্যুদিন। তার দু-বছর বাদে ক্ষেত্রমোহন (গৌরীশঙ্করের পালিত পুত্র) আবার 'সম্বাদ রসরাজ' বের করেছিলেন। কিন্তু রসরাজের স্বভাবদোষ। নিন্দামন্দের জন্যে ক্ষেত্রমোহনও ভোগ করেছিলেন রাজদণ্ড। তারপরেই আরেকরকম। একেবারে আরেকরকম পত্র

হ'য়ে বেরোলো রসরাজ। নিন্দা-মন্দ কিম্বা কটু-কাটব্যের পত্র নয়, সাহিত্যপত্র।

তা নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' কিন্তু ভারী একটা মজার মন্তব্য করেছিলো—যাহা হউক ইহার নামটীতেও আমাদিগের অরুচি জন্মিয়াছে। সম্পাদক এই সঙ্গে নামটীও পরিবর্ত্ত করুন।

কিন্তু ওদিকে, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্র নিয়ে কী কাণ্ড? ব্যাপারটা একেবারে গোড়া থেকে খুলে বলা দরকার।

১৮৪৭ সালে প্রথম বেরোয় 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'। একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রভাকর প্রেসে ছাপা হ'তো। সম্পাদক—'প্রভাকরের' সেই ঈশ্বরচন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকার অবস্থা খানিক সচ্ছল হ'লো। তখন থেকে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদক হিসেবে আর নিজের নাম দিতেন না 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'। দিতেন তাঁর এক জ্ঞাতিভাইয়ের নাম—নবকৃষ্ণ রায়।

নামে নবকৃষ্ণ, কিন্তু আসলে সাধুরঞ্জনের কাজ-কর্ম করতেন 'প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র।

অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো 'সাধুরঞ্জন'। জ্ঞানবিশারদ থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র অবধি অনেকেই 'সাধুরঞ্জনে'র নিয়মিত পাঠক। অন্তঃপুরের মহিলারাও পড়তেন। এমন কি, কেউ-কেউ কবিতাও পাঠাতেন।

কর্তৃপক্ষের বিবরণ থেকে জানা গেছে যে 'সাধুরঞ্জনে'র বহুল প্রচার দেখে কলকাতার 'সরিফ সাহেব' উক্ত পত্রে আপন আপিসের বিজ্ঞাপন দিতেন। পুরোদমে চলেছিলো 'সাধুরঞ্জন'।

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মারা গেলেন।

১২৬৬ সালের বৈশাখ অবধি বেরিয়েছিলো সাধুরঞ্জন। তারপরে আর বেরোয়নি। কেন বেরোয়নি, কর্তৃপক্ষ তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের সেই বিবরণের ওপর নির্ভর ক'রেই ঘটনাটি নিবেদন করি।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে নবকৃষ্ণ একদিন এলেন সাধুরঞ্জনের কর্তৃপক্ষের কাছে। নবকৃষ্ণ নিজেই সাধুরঞ্জন প্রকাশ করতে চায়।

কর্তৃপক্ষ বললেন—সাধুরঞ্জন স্বচ্ছন্দে বের করো। তাতে কোনো আপত্তি নেই। তা থেকে যা কিছু প্রাপ্তি হবে, তাও তোমাকে দিতে রাজি আছি।

কিন্তু সাধুরঞ্জন তো নবকৃষ্ণের সম্পত্তি নয়। নবকৃষ্ণেব নামে কেবল বেনামী করা হয়েছিলো। সেকথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁর শেষ উইলপত্রে স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন। তাছাড়া বিস্তব ভদ্রলোকও এ-ব্যাপারের সাক্ষী আছেন। না, সাধুরঞ্জনের স্বত্ব নবকৃষ্ণকে দেওয়া যাবে না।

শুনে নবকৃষ্ণ কথাটি কইলেন না। চ'লে গেলেন। কাউকে কিছু না ব'লে নবকৃষ্ণ অতঃপব একদিন গেলেন সরিফ সাহেবের আপিসে। সাধুরঞ্জনের ছ-মাসেব সবিফ সেলের বিজ্ঞাপন বাবদ যে-টাকা প্রাপ্য ছিলো, তা নিয়ে নিলেন নবকৃষ্ণ। এ-কার্য কেন করলেন? নবকৃষ্ণ চুপ। তারপর আবেকদিন বাত্রে প্রেস থেকে সাধুরঞ্জনের হেডিং এবং রুল-টুল ইত্যাদি নিয়ে কেটে পড়লেন নবকৃষ্ণ। মাসখানেকের বেশি হ'য়ে গেলো, তাঁর আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

সাধুরঞ্জদের কর্তৃপক্ষ পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে আদ্যন্ত খবর খুলে জানালেন। কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করছেন সাধুরঞ্জন পুনঃপ্রকাশের, যদি একান্তই না পারেন তো বদলে অপর পত্র প্রকাশ করবেন।

অনেক দুঃখ করলেন কর্তৃপক্ষ। ঈশ্বর গুপ্তমশাই কী না করেছেন এই নবকৃষ্ণের জন্যে। নবকৃষ্ণের খাওয়া-পরা বই-পুঁথি এমন কি তার পরিবারের জন্যেও অর্থ-সাহায্য করেছেন। আর, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে?

কর্তৃপক্ষ সদুঃখে লিখেছেন—তাঁহার পরলোকগমন হইলেও আমরা নবকৃষ্ণ রায়কে সর্ব্ববিষয়েই সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম, তাঁহার প্রতি এক দিবসের নিমিত্তও স্নেহশূন্য হই নাই, প্রভাকর যন্ত্রালয়ের অনেক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি পরিতাপ! তাঁহার এমত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল যে, অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমারদিগের সেই সুদৃঢ় স্নেহরজ্জুকে একেবারে ছেদ করিয়া গেলেন।

তা বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হ'লে অন্যের কুপরামর্শ শুনে অবস্থা এমনিই হয়। কর্তৃপক্ষ আরো একটু যোগ করেছেন নবকৃষ্ণ সম্পর্কে—কতিপয় কুচক্রির কুপরামর্শ শ্রবণ করত সাধুরঞ্জনের হেড চুরি ও টাকা হরণ করিয়া অভিমানভরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিয়া সম্পাদক হইবেন, অধুনা তাঁহার কুচক্রকারি কুমন্ত্রিগণ কোথায়! কৈ সাধুরঞ্জন পত্র প্রকাশ হইল না?

পাঁচ

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার—এই দুই স্বনামধন্য ব্যক্তির সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় 'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য মহিলারা। সেকথা প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই খোলাখুলি বিজ্ঞাপিত হয়েছে: এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

এই বিজ্ঞাপনটি যে-সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে, সেই সংখ্যা থেকেই রচনারও একটু নমুনা দেখাই:

শ্যামলাল বাবুর শ্রাদ্ধ বড় জাঁকজমকে হইল, রুপার ষোড়স্ হয়, আর থাল ঘড়া গাড়ু বনাৎ গরদের কাপড় অনেক উৎসর্গ হয়, ব্রাহ্মণ-ভোজনও উত্তম হয়। সকলেই শ্যামলালবাবুর পুত্রগণকে প্রশংসা করিতেছে।

লোকে কি 'শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড়মানুষেরাই স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরি শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, শ্রাদ্ধের দ্বারা লোকে স্বর্গে গেলে; গরীব লোকের স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এমন কথা কখন সত্য হইতে পাবে না। ধনী হইলেই লোকে যে পুণ্যবান হয় তাহা নয়। দেখ অনেক বড়মানুষ মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর। প্রায় সকলেই মদখোর, বেশ্যাবাজ। ইহারা মরিলে ইহাদিগের শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইবেক, শ্রাদ্ধের জোরে ইহারা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবেক না, কারণ ইহারা স্বর্গে গেলে স্বর্গ জুয়াচোরে মাতালে পরিপূর্ণ হইবেক, এমন স্থান ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নয়।

ধন কিম্বা শ্রাদ্ধের জোরে লোকে স্বর্গ গমন করে না। মানবেরা ধনীকে সম্মান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে যেমন বড়মানুষ তেমনি গরীব, উভয়েই সমান। ধনী হউক নির্ধন হউক, তিনি পাপীকে দণ্ড করেন, কেবল পুণ্যবানকে স্বর্গে যাইতে দেন।

যদি বল পুণ্যবানেব লক্ষণ কি? তাহার উত্তর এই, সত্য বাক্য কহা, অনভিমানী হওয়া, মদ্যপান বেশ্যাবাজি ত্যাগ করা, সর্ব্বসাধারণেব প্রতি সদ্ব্যবহার করা, পিতামাতার সেবা করা, পত্নীকে ভালবাসা, সন্তানদিগকে লেখাপড়া উত্তম আচরণ শিখান, সাধ্যক্রমে পরের, বিশেষতঃ গরীব অনাথার উপকার করা, এই সকল লক্ষণ যাহার আছে, তিনিই পুণ্যবান, তাহার ধন থাকুক বা না থাকুক, তাহার শ্রাদ্ধ হউক বা না হউক তিনি অবশ্য অবশ্য স্বর্গ-প্রাপ্ত হইবেন।

এই 'মাসিক পত্রিকাতে'ই সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।

প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম নিতে মনে পড়ে প্যারীচরণ সরকারের নাম। কেন মনে পড়ে? বোধ হয় নামের মিল আছে বলে। আর প্যারীচরণ সবকারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় অনিবার্যভাবে এসে যায় 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকার নাম।

'এই এডুকেশান গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ প্রত্যেক শুক্রবারে

ইটালী পদ্মপুকুর ১৪ নম্বর ভবনে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, মাসিক অগ্রিম মূল্য সাড়ে ।১০ চারি আনা মাত্র।'

পত্রিকাখানি প্রথমে প্রকাশিত হয় ৪-জুলাই, ১৮৫৬ সাল। পত্রিকার প্রতিপোষক—শিক্ষাবিভাগের দক্ষিণ বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টার হজসন প্র্যাট সাহেব। সম্পাদক—রেভারেণ্ড ও-ব্রায়াণ স্মিথ। কিছুকাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন মাসিক হুশো টাকা সরকারী সাহায্য বরাদ্দ।

১৮৬৩ সালের ৩১-ডিসেম্বর একটি প্রস্তাব উঠলো—পত্রিকা খানাকে সরকারী মুখপত্র করা হোক। ফলত সম্পাদকের পারিশ্রমিক বেড়ে হলো তিনশো টাকা। ব্যবস্থা হ'লো যাতে সরকারী ও বেসরকারী সংবাদ নিয়ে সম্পাদক মশাই সাময়িক খবরাখবর বের করতে পারেন।

১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে সরকার সম্পাদক নিযুক্ত করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারকে। প্যারীচরণের আমলে পত্রিকাখানার সৌষ্ঠব বেড়েছিলো, গ্রাহকসংখ্যাও বেড়েছিলো। যথার্থ কৃতিত্বের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদন করছিলেন প্যারীচরণ।

তু-বছর ভালোয়-ভালোয় কাটলো। তারপর ঘটলো এক নিদারুণ তুর্ঘটনা। ই বি রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনে ট্রেণ-তুর্ঘটনা।

তুর্ঘটনার ফলে হতাহতের রিপোর্ট দিলেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। সেই রিপোর্টের ওপর নির্ভর ক'রেই সরকারের রিপোর্ট বেরোলো।

কিন্তু সেই রিপোর্ট জনসাধারণের বিশ্বাস হয় না। ঐ রিপোর্টের মধ্যে নাকি ভেজাল আছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট, ন্যাশন্যাল পেপার, ইণ্ডিয়ান মীরর, সোমপ্রকাশ,

প্রভাকর এবং চন্দ্রিকা পত্রিকাতেও দুর্ঘটনার সংবাদ বেরোলো প্যারীচরণও ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে বিশ্বস্তসূত্রে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ বেরিয়ে পড়ে।

বাঙালী দর্শকদের কথা হয়তো সবাই গ্রাহ্য করবেন না, কিন্তু কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ্ সাহেব এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সুপ্রীম কৌন্সিলের মেম্বর স্যার্ রিচার্ড টেম্পল সাহেবের কথা তো অবশ্যই মান্য করতে হয়। এঁরাও স্বচক্ষে দু-জন আহত ব্যক্তির দুর্দশা দেখেছেন। আহত হয়ে প'ড়ে আছে, কেউ তত্ত্ব-তালাস করছে না,—হগ্ সাহেব গিয়ে ব্যাপারটা ই বি রেলওয়ের প্রধান কর্মচারী প্রেস্টেজ সাহেবকে বললেন। তাতে প্রেস্টেজ হগ্‌কে জবাব দিলেন—তোমার এ-বিষয়ে কথা কইবার অধিকার নেই।

কিন্তু যে-রকম শোনা যাচ্ছে, তাতে রেলওয়ে কর্মচারীদের প্রতি অনায়াসেই অধিক দোষারোপ করা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি হত ব্যক্তিদের রাত্রিকালে গোপনে নতুন ট্রেণ আনিয়ে স্থানান্তরিত করা এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হ'লো, তা কাউকে না জানানো, —এ সব অত্যন্ত সন্দেহের কারণ। এমন চেষ্টা কেন করা হ'লো না, যাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন এসে স্ব স্ব জাতির প্রথানুসারে মৃতের শেষকৃত্য সমাধা করতে পারে? দুর্ঘটনার পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত মৃতদেহ রাখা হ'লে নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের যাত্রীদের আত্মীয়েরা এক স্ব-স্ব আত্মীয়ের শেষকাজ করতে পারতো, সেটুকু থেকেও আত্মীয়বর্গকে বঞ্চিত করা হ'লো কেন? যে-কখানা গাড়ী ভেঙে গিয়েছিলো, রাত্রের মধ্যে সেগুলোকে আগুনে ভস্মীভূত করবার তাৎপর্য কী? গোপন করবার জন্যে এতদূর ব্যগ্র হবার কি প্রয়োজন ছিলো?

সকলেই বলছে যে, তাড়াতাড়িতে কয়েকজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃতব্যক্তিদের সঙ্গে এক গাড়িতে নিক্ষেপ ক'রে পদ্মার জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

যে-সমস্ত ব্যক্তি হত বা আহত হয়েছিলো, তাদের ঘড়ি, অলঙ্কার, টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কোথায় গেলো কে নিলো তারও কিছু অনুসন্ধান হয় নি।

এসব কথা প্যারীচরণ খোলাখুলি লিখলেন এডুকেশন গেজেটে। পরিশেষে যোগ করলেন—যাহাতে এই দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়, এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সত্য প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করুন। ৪।৫ জন সুযোগ্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তি কিছুদিন এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত ব্যক্ত হইবে। অনেক দূর পর্য্যন্ত এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জনরব হইয়াছে। যতদিন না গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষরূপ অনুসন্ধান না হইবে ততদিন রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ভয়ানক দূষণীয়তার অপবাদ হইতে মুক্তি অথবা কৃত অপরাধের যোগ্য দণ্ড পাইবে না, এবং দেশবাসীদিগের নানাপ্রকার সংশয়ও দূরীকৃত হইবে না। অতএব একটি কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

কিন্তু সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এ-জাতীয় উক্তি সরকারের সহ্য হ'লো না। সরকার বিরক্ত হলেন। প্যারীচরণকে জানালেন যে জনসাধারণকে ভীত ও বিভ্রান্ত করবার জন্যে মিথ্যে সংবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে এই বিবরণ রচিত হয়েছে। যথাবিহিত অনুসন্ধান ক'রে সত্য সংবাদ পরিবেশন করা উচিত ছিলো।

সরকারের এই অসম্মানজনক উক্তি প্যারীচরণও নিঃশব্দে সহ্য করলেন না। সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে, যথার্থ সংবাদ নিয়েই

তিনি ঐ বিবরণ বের করেছেন। হ্যাঁ, যথাবিহিত অনুসন্ধানও আগেই করেছেন। সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে ব'লে এমন কোনো কথা নেই যে সম্পাদক সাময়িক ঘটনার ওপর আপন বক্তব্য বলতে পারবেন না।

কিন্তু সরকার তথাপি পূর্বমন্তব্য প্রত্যাহার করলেন না। প্যারীচরণের আত্মমর্য্যাদায় লাগলো। অগত্যা তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন।

•

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায়ও তো প্রকাশিত হয়েছিলো উক্ত দুর্ঘটনার বিববণ। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে আছেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর বড়মামা। শিবনাথের বাবা শিবনাথকে কলকাতায় রেখে যেতে এসেছিলেন পড়াশোনার সুবিধার জন্যে। এসব অবশ্যি অনেক আগের কথা। তখন পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশের' জন্ম হয়নি।

বড়মামার বাড়ি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে। শিবনাথকে সেখানে রেখে শিবনাথের বাবা গ্রামে ফিরে গেলেন। সাব্যস্ত হয়েছে, অতঃপর এখানে থেকেই শিবনাথ পড়াশোনা করবে। ভালো কথা।

বড়মামার বাড়িতে অবশ্যি আরো ভালো কথা আছে। এখানে প্রায়ই বিদ্যাসাগর মশাই আসেন। বড়মামার সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করেন। একখানা সাপ্তাহিক পত্র বেরোবে, তাই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা। পত্রিকার নাম পর্যন্ত স্থির —সোমপ্রকাশ।

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ বের হ'লো।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতেই ছাপাখানা; পত্রিকার বিলি-ব্যবস্থা, মুদ্রণ-টুদ্রণের জন্যে বাড়ীতে তখন বিস্তর লোকজন। বাড়ি একেবারে সরগরম। সারাদিন তো বটেই, রাত দশটা-

এগারোটা অবধি বাড়িময় হৈ-হট্টগোল। বাড়িভর্তি একদঙ্গল পুরুষ; বয়সে শিবনাথ সর্বকনিষ্ঠ। দলের মধ্যে আছে, অতএব সে-বেচারীরও নানারকম কাজকর্ম। এই বাসন মাজো, এই রান্না করো। ওর মধ্যেই কোনোরকমে শিবনাথ নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যায়।

হপ্তার অন্যান্যদিন তবুও একরকম, শনিবার রাত আর রবিবার সারাদিন বাড়িতে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। ফি-শনিবারে দ্বারকানাথ দেশে যেতেন। তখন আর কথা কি। গাঁজার ধোঁয়ায় আর মদের গন্ধে বাড়ী অন্ধকার। খরচ বাবদ দ্বারকানাথ যা পয়সাকড়ি দিয়ে যেতেন, তা উড়ে যেতো মদে গাঁজায় আর ঢলাঢলিতে। রান্নাঘরে অনেক রবিবার তাই স্রেফ ভাতে-ভাত বরাদ্দ।

মন্দের ভালো আছে একটা। বেলেল্লাপনার আগে অনেকদিন ওরা শিবনাথকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতো।

একদিন একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা।

ঐ বাড়িতে একজন ছিলেন -'মামা'। বিশ্বসংসারের সকলের মুখে উনি—'মামা'। ওর আসল নামের কেউ ধার ধারে না, সবাই ডাকে—'মামা'।

মামা কম্পোজিটার, বিল-সরকার। মদে এবং আনুষঙ্গিকে মামার প্রবল আসক্তি।

এক রবিবার সন্ধ্যার পর খবর এলো, সুকিয়া ষ্ট্রীটের একজন গণিকার গোলপাতার ঘরের দাওয়ায় মামা বমি ক'রে হাফ্-অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে। তুখোড় গালাগাল দিচ্ছে গণিকাটি। কিন্তু তার থেকেও খারাপ কথা, মামা দ্বারকানাথের বাড়ির লোক ব'লে সে নাকি দ্বারকানাথের নাম নিয়ে পর্যন্ত কটূকথা কইছে।

গণিকার মুখে দ্বারকানাথের নাম! শিবনাথের অসহ্য লাগলো।

বাড়িতে যারা বয়স্ক, তারা কেউ ওখান থেকে মামাকে নিয়ে আসতে যাবে না। যাবে কি, নিজেরাই যে একেকজন নেশায় টঙ হ'য়ে আছে।

অগত্যা শিবনাথ নিজেই চললো। সঙ্গে এক চাকর। যেদো। তা এ-ব্যাটাও গাঁজাখোর।

সেখানে যেতেই গালাগালির পশলা সুরু হ'য়ে গেলো। শিবনাথ বললো—চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিষ্কার করছি, ওকেও তুলে নিয়ে যাচ্ছি। গালাগালি দিও না।

বমি পরিষ্কার করা হ'লো। তারপর যেদোকে মামাকে নিয়ে আসতে ব'লে শিবনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চললো। মাতাল-টাতালের কাছাকাছি শিবনাথ বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ঘেন্না করে, ভয় করে।

বাড়ি ফিরে শিবনাথ যেদো আর মামার জন্যে ব'সে আছে। কিন্তু কোথায় কে? অনেকক্ষণ বাদে জোর দোরনাড়ার শব্দ। শিবনাথ দোর খুলে দিলো। যেদো এসেছে। মামা নেই?

মামা কোথায়?

সেকথার কোন জবাব হলো না। যেদো মামার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটুকাটব্য বর্ষণ ক'রে একখানা ছোরা নিয়ে দুয়ারের কাছে ব'সে পড়লো। মামা আসুক। তাকে কাটবো।

মহাবিপদ। মাতালে আর গেঁজেলে কী নিয়ে লেগেছে কে জানে। বাড়িতে যারা আছে, তাদের ডাকাডাকি ক'রে কোনো ফল হ'লো না। ওরা বললো—মরুক হতভাগারা।

শিবনাথ তখন বাইরের দরজার ভেতরের দিকে এক তালা লাগালো। যেদো উঠে হাত চেপে ধরলো শিবনাথের—তালা লাগাও কেন?

শিবনাথ বললো—তালার চাবি তো ভেতরে আমাদের কাছে রইলো, মামার হাতে তো রইলো না। এলে খুলে দেবো, তার ভয় কি ?

তাই শুনে যেদো বসলো। ছোরা নিয়ে, বাইরের দরজার কাছে। মামা আসুক। তাকে কাটবো।

উপরের ঘরে শুতে গিয়ে শিবনাথের কানে এলো, মামার মাতালকণ্ঠনিঃসৃত গান। এলো কোত্থেকে ? বাড়ীর পেছনে আরেক গণিকাগৃহ, মামা সেখানে গান ধরেছে।

সে-রাত্রে মামা বাড়ি এলো না।

পরদিন দ্বারকানাথ এসে সব শুনলেন শিবনাথের কাছে। এককথায় এদের দলশুদ্ধ তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে।

কিছুকাল পরে মাতলা রেলওয়ে খুললো।

দ্বারকানাথ কলকাতার বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেলেন নিজগ্রামে, চাঙরিপোতায়। ছাপাখানাও নিয়ে গেলেন চাঙরিপোতায়। সোমপ্রকাশ চাঙরিপোতা থেকেই প্রকাশিত হ'তে থাকলো।

কলকাতায় কলেজ। অধ্যাপনার জন্যে দ্বারকানাথ ডেলি প্যাসেঞ্জার হ'য়ে যাতায়াত করেন। গাড়ি আসতে দেরি আছে হয়তো, দ্বারকানাথ একপাশে আপন মনে পাঠমগ্ন। কলেজে যতক্ষণ থাকতেন, কে বলবে দ্বারকানাথের অধ্যাপনা ছাড়া ইহসংসারে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য আছে। যখন বাড়ি থাকতেন, কে বলবে দ্বারকানাথের সোমপ্রকাশ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা আছে।

এক সোমবারের সোমপ্রকাশের একটা হেডিং—ফলনা সাহেব ও চটি জুতা।

বৃত্তান্তটা কী? আর কি, দ্বারকানাথের ভাগ্নে আছে আদিকাণ্ডে। সেই শিবনাথ।

একখানা সরকারী কাগজ উড্রো সাহেবের হাতে দিয়ে আসবার জন্যে শিবনাথকে দিয়েছিলেন শিবনাথের বাবা।

উড্রো সাহেব স্কুল-ইন্‌স্পেকটার।

কলেজের পথে শিবনাথ উড্রো সাহেবের অফিসে গিয়ে হাজির। সাহেব তখন পাশের ঘরে খেতে বসেছেন। শিবনাথ অপেক্ষা করতে লাগলো।

আহারান্তে সাহেব এলেন। যথারীতি অভিবাদন ক'রে তাঁর হাতে কাগজখানা দিলো শিবনাথ। কিন্তু সাহেব সেখানা নিলেন না। বললেন—তুমি অপিসঘরের বাইরে জুতো খুলে আসোনি কেন?

তেমন নিয়ম আছে নাকি? তা জানলে শিবনাথ এ-ঘরে ঢুকতো না।

নিয়ম-টিয়ম বাজে কথা, আসলে শিবনাথের পায়ে চটি দেখে সাহেব চটেছেন। স্বয়ং সাহেবের পায়ে বুট, কেরাণীবাবুরাও বুট প'রে ঘোরাঘুরি করেন, তাতে কি সাহেব কিছু বলে? উঁহু।

তা ব'লে বুটের সঙ্গে-সঙ্গে চটিও আসবে নাকি? বুটের সঙ্গে তুল্য হবে চটি?

শিবনাথ যদি চটির বদলে বুট প'রে আসতো, সাহেব টু শব্দটিও করতেন না।

কিন্তু হায়, শিবনাথের তখন দুরবস্থার চূড়ান্ত। তার সাধ্য কী যে সে বুট পায়ে দিয়ে হাঁটে।

সাহেব বললেন—তুমি জুতো খুলবে কি না বলো।

কিন্তু শিবনাথ কিছুতেই জুতো খুলবে না।

সাহেব বললেন—তবে তোমার চিঠি নেবো না।

শিবনাথ সাহেবের ডেস্কের ওপর রাখলো চিঠিখানা। বললো—ও আপনাদেরই কাগজ ; নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি ক'রে গেলাম।

উড্রো সাহেব কিছুতেই জুতো খোলাতে পারলেন না। শুনে দ্বারকানাথ খুব খুশি হলেন। বললেন --তুমি আমার ভাগ্নের মতো কাজ করেছো।

দ্বারকানাথের কথামতো শিবনাথ সোমপ্রকাশের জন্যে 'উড্রো সাহেব ও চটি জুতা' শিরোনামায় এই ঘটনার একটা বিবরণ লিখে দিলো। সেটাই সোমপ্রকাশে ছাপলেন দ্বারকানাথ, 'ফলনা সাহেব ও চটি জুতা' হেডিং দিয়ে। তার সঙ্গে দ্বারকানাথ যোগ ক'রে দিলেন আরো কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম বাক্য, উড্রো সাহেবের উদ্দেশ্যে।

এ-জিনিস প'ড়ে উড্রো সাহেব হাড়ে-হাড়ে চ'টে রইলেন শিবনাথের ওপর। আপিসের বাবুদের ব'লে রাখলেন এই ছেলে কলেজ থেকে বেরিয়ে যদি কর্মপ্রার্থী হয়, আমাকে জানিও।

মানে বোধ হয়, এখন তো আর কিছু করা যাচ্ছে না, কাজের সময় একহাত দেখে নেবো ছোকরাকে।

গ্রামের সংস্কৃত-ইস্কুলের প্রায় সমস্ত দায়িত্বই দ্বারকানাথ স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। বলতে গেলে, ইস্কুলের সমস্ত খরচই তাঁকে চালাতে হয়। দরিদ্র অধ্যাপক-ব্রাহ্মণ মাসের গোড়ায় কলেজের মাইনে পেয়ে ফিরতি-পথে প্রথমেই যান ইস্কুলে। আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখে নিজের মাইনে থেকেই দরকার মতো টাকা দিয়ে আসেন ইস্কুলে, তা না হ'লে মাষ্টারমশাইদের মাইনের ব্যবস্থা হয় কী প্রকারে ? তারপর সংসার আছে, সোমপ্রকাশ আছে।

২-জানুআরি, ১৮৬৫ সালের সোমপ্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন ঃ

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। অগ্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশ যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূর সাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্‌মুখ হইব না।……

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

অতঃপর কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হলেন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু সেসব কথা আপাতত থাক।

১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। অবস্থা এমন যে কাজ-কর্ম একেবারেই করতে পারেন না। ঠিক করলেন কলেজ থেকে পেন্সন নিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চ'লে যাবেন বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে। কিন্তু যাবেন যে, তাঁর ইস্কুল, তাঁর সংসার, তাঁর সোমপ্রকাশের ভার দিয়ে যাবেন কাকে? এসব দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করবে কে?

আর কে, তাঁর ভাগ্নে, শিবনাথ।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে দ্বারকানাথ কাশী চ'লে গেলেন। কয়েকমাস সোমপ্রকাশ রইলো শিবনাথের হাতে।

ফিরে এসে সে-বছরই ২৭-জুলাই থেকে আবার দ্বারকানাথ আগের মতো 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন আরম্ভ করলেন। না, আগের মতো না। আগের মতো আর কাজ হ'তো না, পারতেন না।

ছয়

কিন্তু কথায়-কথায় কোথায় এসে পড়েছি। এই জন্যেই বোধ হয় সর্বশাস্ত্রে বাক-সংযম প্রশংসিত। সত্যি, কথায়-কথায় কোথায় এসে পড়েছি। সময়ের হিসেব রইলো না। কথাব স্রোতে সময়ের হিসেব ভেসে গেলো, কতো দরকারী কথা হ'লো না, পিছনে প'ড়ে রইলেন কতো স্মরণীয় সাহিত্যসাধক। একজন যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমারের দাদা -জ্যেঠতুতো দাদা—হলেন গিয়ে হরমোহন বাবু। হরমোহন দত্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো স্বনামখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। এই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়ে গেলো অক্ষয়কুমারের।

প্রথমদিকে কবিতা লিখতেন অক্ষয়কুমার। একখানা কবিতার বই ছিলো তাঁর 'অনঙ্গমোহন'। কিন্তু অক্ষয়কুমার কি পদ্যই লিখবেন, গদ্য লিখবেন না? অক্ষয়কুমার ভাবলেন। গদ্য না পদ্য? লোকের উপকার কিসে বেশি হবে? পদ্য না গদ্য?

একদিন অক্ষয়কুমার গিয়েছেন 'প্রভাকব' পত্রিকার আপিসে, ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে। ঈশ্বরচন্দ্রের সহকারী ভদ্রলোকটি আপিসে আসেননি সেদিন। ঈশ্বরচন্দ্র একখানা 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা দিলেন অক্ষয়কুমারকে, খানিকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন অনুবাদ ক'রে দাও!

অক্ষয়কুমার বললেন আমি কখনো গদ্য লিখিনি, আমি লিখতে পারবো না।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—আমার বিশ্বাস, তুমি পারবে, না হ'লে বলতাম না।

অগত্যা আর উপায় কি, অক্ষয়কুমার অনুবাদটুকু ক'রে ফেললেন। লেখা প'ড়ে ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু বিমুগ্ধ। অক্ষয়কুমারকে বললেন—অনেকদিন থেকে এই কাজ যিনি ক'রে আসছেন, তিনিও এরকম সুন্দর লিখতে পারেন না।

অতঃপর 'সংবাদ প্রভাকরে' অক্ষয়কুমারের মতো একজন যোগ্য লেখক সংযুক্ত হলেন। অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্রের স্নেহভাজন, ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারের গুণমুগ্ধ। তারপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তাবেই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বেরোবে, কিন্তু সম্পাদক হবেন কে? প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হ'লো সেজন্যে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন অক্ষয়কুমার। তিনিই সম্পাদক হলেন।

একাদিক্রমে বারোবছর পত্রিকাটি চালিয়েছেন অক্ষয়কুমার। তিরিশটাকা বেতন ছিলো, সেই বেতন ষাটটাকা পর্যন্ত বাড়লো। অক্ষয়কুমার কি কম করেছেন ও-পত্রিকার জন্যে! অক্ষয়কুমার না থাকলে কি ও-পত্রিকার অমন উন্নতি হ'তে পারতো!

স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সেসময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।

১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন অক্ষয়কুমার, আর ১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হ'য়ে গেলেন। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদীর সামনে অক্ষয়কুমার প্রতিজ্ঞা

করলেন—পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ ক'রে এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হবো।

ব্রাহ্ম হলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম থাকেননি অক্ষয়কুমার। ধর্মমত বদলেছেন। ব্রাহ্ম হ'য়েও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না অক্ষয়কুমার। অঙ্ক ক'ষে একদা প্রমাণ করলেন প্রার্থনা অনাবশ্যক। অঙ্কটি দেখুন ঃ

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা ও পরিশ্রম = শস্য

অতএব প্রার্থনার শক্তি = ০

প্রসঙ্গত আরেকটি তথ্য লিপিবদ্ধ করি। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ঘুরে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এসে অক্ষয়কুমার—

হ্যাঁ, অক্ষয়কুমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন গৃহদেবতা নারায়ণকে।

কিন্তু এসব কথা থাক। শুধু শারীরিক অসুস্থতা নয়, আরো কোনো কারণ আছে যার জন্যে একসময় অক্ষয়কুমার উৎসুক ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে যেতে।

আর, ঈশ্বরের দয়া, সেই সময়েই একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কী প্রস্তাব? না, অক্ষয়কুমার নর্মাল স্কুলের হেডমাষ্টার হ'তে রাজি?

রাজি মানে কি। অক্ষয়কুমার মহাসুখে বললেন—তাহলে বাঁচি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুই দিকপতির কাছে অক্ষয়কুমার অশেষরূপে উপকৃত। প্রথম-প্রথম ওঁরা অক্ষয়কুমারের রচনায় নানারকম পরিবর্তন, পরিমার্জন ক'রে দিতেন। থাক সে কথা।

তা ঐ নর্মাল স্কুলেও বেশিদিন কাজ করতে পারেননি অক্ষয়-কুমার। দুরারোগ্য শিরোরোগে তাঁর অবস্থা খারাপ হ'তে লাগলো।

বায়ু-পরিবর্তন চিকিৎসা ইত্যাদিতে খরচ বেড়ে গেলো। তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য করার ব্যবস্থা হ'লো। সে-সাহায্য বেশিদিন নেননি অক্ষয়কুমার। তাঁর বই থেকে আয় বেড়ে গেলো ব'লে তিনি নিজেই তত্ত্ববোধিনী সভাকে জানালেন—না, আর সাহায্যের দরকার নেই।

ভারি রসিক ছিলেন অক্ষয়কুমার। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর পত্রের অংশ থেকেই দুটি দৃষ্টান্ত আহরণ করি।

একজায়গায় অক্ষয়কুমার রাজনারায়ণকে লিখছেন—আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

আরেক জায়গায় অক্ষয়কুমার লিখছেন—আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষস্য বিষমৌষধং।" বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, ঊষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

প্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ছিলো প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। প্রায়ই বিদ্যাসাগর আসতেন প্যারীচরণের বৈঠকখানায়। আরো অনেকে আসতেন। আসর জ'মে উঠতো।

প্যারীচরণ আর বিদ্যাসাগর—ঐ বৈঠকখানায় ব'সে দু-জনে একদিন সাব্যস্ত করলেন—দু-জনে দুখানা শিশুশিক্ষার বই

লিখবেন। প্যারীচরণ লিখবেন একখানা ইংরেজি বই, বিদ্যাসাগর লিখবেন একখানা বাঙলা বই।

বিদ্যাসাগর লিখলেন বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। লিখলেন ইস্কুল পরিদর্শনে যাবার পথে, পাল্কিতে ব'সে।

বিদ্যাসাগর দৃষ্টি রেখেছেন সর্বত্র। বালকের দিকে, বয়স্কের দিকে, নরনারীর দিকে, শিক্ষার দিকে, সমাজের দিকে, আত্মসম্মানের দিকে, নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙলা দেশের দিকে, ভাষার দিকে, সাহিত্যের দিকে, সত্যের দিকে।

এককথায় সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসগর। কথা উঠলো--চাকরি ছেড়ে খাবে কী ক'রে?

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন—আলু-পটল বেচবো, মুদিদোকান করবো, কিন্তু আত্মসম্মান নষ্ট হবার মতো কোনো চাকরি করবো না।

এককথায় মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া কি সোজা কথা। ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেব বিবেচনা ক'রে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। চাকরি ছেড়ে দিলে দিন চলবে কী ক'বে?

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—একপো চাল পেলে গরীব বামুনের দিন চ'লে যায়। তাহলে আর পয়সার লোভে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করি কেন?

প্রেস খুলেছিলেন বিদ্যাসাগর। বই ছাপাতেন প্রেসে। প্রেসের নাম—সংস্কৃত যন্ত্র। এই প্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন দুজন—বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

এই তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বাঙলাভাষা নিয়ে একদিন ইয়েটস সাহেবের তুমুল তর্ক। উত্তেজনার মুখে সাহেব খোঁচা দিয়ে ব'লে ফেললেন—আপনি কোথায় বাঙলা শিখেছেন?

যেমন কুটিল প্রশ্ন, সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি একটি তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন তর্কালঙ্কার মশাই—বিলাতে।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' বিদ্যাসাগরের একখানি বিখ্যাত বই। প্রকাশিত হবার আগে বইখানি বিদ্যাসাগর প'ড়ে শুনিয়েছিলেন দুজন পণ্ডিতকে। একজন—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। আরেকজন—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

যেমন হ'য়ে থাকে সচরাচর, শুনে দুজনেই কিছু-কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের মতানুসারেই বিদ্যাসাগর মশাই দু-একটি শব্দ পরিবর্তন করেছিলেন।

তারপর মদমোহন তর্কালঙ্কার মারা গেলেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ তর্কালঙ্কার মশায়ের জামাই। তিনি শ্বশুরের একখানা জীবনচরিত লিখলেন। সেই জীবনচরিতে উল্লিখিত হ'লো 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে এক টুকরো অপরূপ তথ্য: বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'তে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কারের দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় উহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কিন্তু সত্যিই কি এমন কথা বলা যেতে পারে? না, পারে না।

তর্কালঙ্কার মশাই অবশ্যি মারা গেলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখনো জীবিত। এ-বিষয়ে তাঁকেই বিদ্যাসাগর চিঠি লিখলেন--

অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু—

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কারের দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতাল পঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্রবাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতাল-পঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কতদূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মনঃ

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দু-দিনেই সরাসরি জবাব এলো—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-প্রতিমেষু।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতাল-পঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম! তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত, আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি বেতাল-পঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতাল-পঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন তদ্বিষয়ে আমার সম্মতি ইতি—

সোদরাভিমানিনঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

তর্কালঙ্কার মশায়ের জীবনচরিতকার যোগেন্দ্রনাথ অতঃপর কী বললেন শুনবেন? উনি নাকি ওকথা পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায়ের কাছে শুনেছিলেন। কে জানে, কী শুনতে কী শুনেছিলেন। যাক গে।

'সংস্কৃত যন্ত্রে'র কথায় ফিরে আসা যাক। এই প্রেস খোলা হয়েছিলো ছশো টাকা ঋণ নিয়ে। ঋণ দিয়েছিলেন নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। ঋণ নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

যথাকালে ঋণশোধের উপায় হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর বিষম ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। খবর শুনে মার্শাল সাহেব ঋণ শোধের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মার্শাল সাহেব জানালেন যে বিদ্যাসাগর যদি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি নতুন শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেন তো মার্শাল সাহেব স্বয়ং একশো খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল' কিনতে রাজি আছেন। দাম বাবদ দেবেন ছশো টাকা। ঋণ শোধ হ'য়ে যাবে।

সেই কথাই রইলো। বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে নিয়ে এলেন 'অন্নদামঙ্গলে'র মূল পাণ্ডুলিপি। ছাপলেন। ঋণ শোধ হ'লো।

শুধু কি প্রেস? মুদ্রিত ও প্রকাশিত বই বিক্রীর ব্যবস্থাও করলেন বিদ্যাসাগর। একটি বইয়ের দোকান খুললেন—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

বাঙলা অক্ষরের কেসে কোথায় কোন অক্ষরটি থাকলে ছাপাখানার সুবিধা, তা-ও বোধ করি সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের চিন্তায়, চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

; ঃ ! ? চিহ্নগুলি প্রথম কে ঢুকিয়েছেন বাঙলা ভাষার সংস্কারে? বিদ্যাসাগর।

আর, বই-পুঁথির প্রতি কী গভীর ভালোবাসা বিদ্যাসাগরের। গ্রন্থাগার-ভর্তি বই ছিলো তাঁর। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙলা, হিন্দী। অসংখ্য হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি। পাঠান্তে বইগুলো বাঁধিয়ে নিতেন। সুন্দর ক'রে বাঁধাতেন। এ-বাবদে বিস্তর খরচ হ'তো তাঁর।

জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একবার বিদ্যাসাগরকে বললেন—এত টাকা খরচ ক'রে এই বইগুলি বাঁধানো কি ভালো?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন, দোষ কি?

সেই ব্যক্তি বললেন—দোষ কি? ঐ টাকায় অনেকের উপকার হ'তে পারতো।

এ-বিষয়ে তখনকার মতো বিদ্যাসাগর চুপ ক'রে গেলেন। বই বাঁধানোর খরচের কথা ছেড়ে সরাসরি চ'লে গেলেন অন্য কথায়। তারপর খানিক বাদে তামাক খেতে-খেতে হঠাৎ বিদ্যাসাগরের নজর পড়লো ভদ্রলোকের গায়ের শালের দিকে। দিব্যি জিনিসটি। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—আপনার এই শালখানা কতো টাকায় কিনেছেন?

চমৎকার শাল। নানাগুণ এখানার। ভদ্রলোক একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। দাম বললেন শেষকালে—এ-জোড়টি পাঁচশো টাকায় কিনেছি।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন—পাঁচসিকের কম্বলেই তো কাজ চলে, তবুও এত টাকার শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? ও-টাকায়ও অনেকের উপকার হ'তে পারতো। আমি তো মোটা চাদর গায়ে দিয়েই কাজ চালাই।

ভদ্রলোক বুঝলেন বিদ্যাসাগরকে বই বাঁধানোর খরচের কথাটা বলা অন্যায় হ'য়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন ভদ্রলোক। ক্ষমা চাইলেন তারপর।

বিদ্যাসাগর বন্ধু-বান্ধবদের বই নিয়ে যেতে দিতেন আপন গ্রন্থাগার থেকে। সেই বই নিয়েও কী কাণ্ড করেছিলেন একজন বন্ধু। বন্ধুটির নাম বলা নিষেধ। ধরুন, তার নাম ক-বাবু।

একখানা বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই ক-বাবু বিদ্যাসাগরের থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন বাদে বিদ্যাসাগর বইখানা ফেরৎ চাইলেন। ক-বাবু বললেন—সে কি কথা। ও-বই তো আমি ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি।

ফেরৎ দিয়েছে না হাতি। বিদ্যাসাগর নিশ্চিত জানতেন, ক-বাবু ও-বইখানা কস্মিনকালেও ফেরৎ দেয়নি। বিরক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন আর কাউকে বই দেবেন না।

একখানা দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই চ'লে গেলো। আর কি ও-বই কখনো জোগাড় করা যাবে? ও-বই যে জার্মানী ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু, আশ্চর্য কাণ্ড, ও-বইখানাই বিদ্যাসাগর পেয়ে গেলেন। অভাবিত ভাবে পেয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের পরিচিত একজন পুস্তক-বিক্রেতাই ও-বইখানা বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে এলো বিক্রীর জন্যে।

চেনা বইখানা দেখে বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন। সেই পুস্তক-বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন—এ বই তুমি কোথায় পেলে?

আর কোথায়! পুস্তকবিক্রেতা বললো—আজ্ঞে, ক-বাবুর বাড়ি থেকে কিনে এনেছি।

বিদ্যাসাগর আর কোনো কথা বললেন না। নিজের বই নিজেই আবার কিনে নিলেন। তারপর থেকে বই তো দূরের কথা একটুকরো কাগজও কাউকে গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে যেতে দিতেন না।

গ্রন্থসূত্রে আরেকটি প্রবঞ্চনার কাহিনী বলা যাক।

উত্তরপাড়া স্কুলের একটি বালকের চিঠি এলো একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে। চিঠির সারমর্ম অত্যন্ত করুণ। পিতৃমাতৃহীন, সহায়সম্বলশূন্য দরিদ্র বালক। পরের বাড়িতে একমুঠো খেয়ে অনেক কষ্টে ইস্কুলে পড়ছে। বিদ্যাসাগ'র যদি দয়া ক'রে পাঠ্যপুস্তক-গুলি পাঠিয়ে দেন তো ছেলেটি নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়াশোনা করতে পারে।

আর কথা কি। বিদ্যাসাগর দরকারী বইগুলি পাঠিয়ে দিলেন ডাকে, ছেলেটির নামে, ইস্কুলের ঠিকানায়। তারপর বছর-বছর চিঠি আসে—আজ্ঞে, নতুন ক্লাশে উঠেছি, আবার নতুন বই দরকার। বিদ্যাসাগর বছর-বছর ছেলেটিকে ডাকে নতুন-নতুন বই পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বছর পরের কথা। উত্তরপাড়া ইস্কুলের হেডমাষ্টার মশাই দেখা করতে এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। কথায়-কথায় বিদ্যাসাগর সেই ছেলেটির কথা তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন– তোমার ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছেলেটি কেমন পড়াশোনা ক'রে বলো তো।

কিন্তু নাম শুনে ছেলেটিকে ঠাহর করতে পারলেন না হেডমাষ্টার মশাই। বললেন—আমার ইস্কুলের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও-নামের কোনো ছেলে নেই তো।

ও-নামের কোনো ছেলে নেই কি? বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি দিব্যি মাষ্টার তো হে। একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ছে তোমার ইস্কুলে, বছর-বছর ক্লাশে উঠছে, চিঠি লিখে আমার থেকে বই নিচ্ছে বছর-বছর, ডাকে বই পাঠাচ্ছি, সে-ও ঠিকঠাক বই পেয়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছো কি না ও-নামের কোনো ছেলেই নেই তোমার ইস্কুলে। সব ছেলেকে তুমি চেনো না নাকি?

ভালোমানুষ হেডমাষ্টার মশাই সেদিন চুপ ক'রে গেলেন। পরদিন ইস্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন। সব ক্লাশ তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজলেন, কিন্তু কোথায় কে! এ-ইস্কুলে ও-নামের কোনো ছেলে নেই। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে কেউ বই জোগাড় করেনি। তাহলে ব্যাপার কী?

ব্যাপার গুরুতর। অত্যন্ত জটিল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান হ'লো শেষপর্যন্ত।

উত্তরপাড়া ইস্কুলের কাছেই একখানা বইয়ের দোকান। সব সেই দোকানদারের কীর্তি। বছর-বছর কাতর ভাষায় অব্যর্থ চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরের থেকে নতুন-নতুন বই এনেছে, বিক্রী করেছে।

রামকমল ওরফে গুজে নামে একটি শিশু দৌহিত্রকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। গুজেকে দেবার জন্যে সবসময় মজুত রাখতেন নতুন-নতুন সিকি, দুয়ানি, আধুলি, টাকা। যখনই চাইতো, তখনই গুজেকে দিতেন।

বিদ্যাসাগর গুজেকে জিজ্ঞেস করতেন—দাদা, তুমি কাকে ভালোবাসো?

গুজে বলতো দাদামশায়, তোমাকেই খুব ভালোবাসি। আর তোমার চেয়েও তোমার ঐ নতুন-নতুন সিকি-দুয়ানিকে বেশি ভালোবসি।

বিদ্যাসাগর বলতেন—সকলেই তাই করে। তবে তুমি শিশু কি না, বোঝো না, তাই আসল কথাটি ব'লে ফেলো। অন্যেরা মুখে বলে না।

শুধু টাকাকড়ির ব্যাপার নয়, অন্যান্য অভিযোগ নিয়েও মানুষজন আসে বিদ্যাসাগরের কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে শিবনাথের আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত হলেন; দুঃখের কথা

শোনাতে এলেন তারা বিদ্যাসাগরকে। তা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন —সে পাগলার চাকরি ছাড়ার দুঃখের কথা বলবার আর বুঝি জায়গা পেলে না। এক পাগলের কথা বলতে এসেছো আরেক পাগলের কাছে! চাকরি ছেড়েছে বেশ করেছে। পরের গোলামি ক'রে-ক'রে জাতটা জাহান্নামে গেলো। তাঁবেদারি যত ছাড়বে ততই মানুষ বাঁচবে।

আরেকদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। তিনি একনাগাড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে নানা কুৎসা শোনাতে লাগলেন বিদ্যাসাগরকে। বঙ্কিমচন্দ্র কী রকমে রাত কাটায়, তার একটা দীর্ঘ কুশ্রী বর্ণনা দিলেন ভদ্রলোক।

শেষপর্যন্ত শুনলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ঈষৎ হেসে বললেন —ওহে, তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। লোকটা সমস্তদিন গভর্ণমেণ্টের কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার রাত্রিও যদি এই রকমে কাটায়, তাহলে বই লিখতে সময় পায় কখন? তার কেতাবে যে আমার আলমারির একটা সেলফ ভ'রে গেলো।

বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলেছিলেন—কান্নার জোলাপ। বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর বড়ো-বড়ো সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ক'রে বাঙলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ ক'রে গেছেন।

অন্যকথাও বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বলেছেন—বিদ্যাসাগর মশায়ের রচিত ও গঠিত বাঙলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। বঙ্কিমচন্দ্রই লিখে গেছেন— বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।

বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরেও বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুর সংসারের তত্ত্ব-তালাশ করেছেন সবসময়, দীনবন্ধুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন দুঃসময়ে, সাহায্য করেছেন।

কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের জন্যে বিদ্যাসাগর যা করেছেন বাস্তবে তার তুলনা মেলে না। মধুসূদনকে ঋণদায় থেকে বাঁচানোর জন্যেই বিদ্যাসাগর একদিন নিরুপায় হ'য়ে বিক্রী করেছেন নিজের ছাপাখানার দুই-তৃতীয়াংশ। সেসব কথা না শুনেছেন কোন বাঙালী ?

গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ একেবারেই অপছন্দ করতেন। ঠাট্টা ক'রে বলতেন—

তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।

এখানে বলে রাখা ভালো, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের মনোভাব পরির্তিত হয়েছিলো। তিনি স্বাদ পেয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে।

মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে বলেছেন দয়ার সাগর, দীনের বন্ধু, করুণার সিন্ধু। স্ত্রীর কাছে একদিন বিদ্যাসাগরের যে-পরিচয় দিয়েছিলেন মাইকেল, তা-ও কম সার্থক নয়। সত্যিই বিদ্যাসাগরের মধ্যে সম্মিলিত হ'য়ে আছে the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.

মাইকেল মধুসূদনের লেখা প্রথম বাঙলা বইয়ের নাম 'শর্মিষ্ঠা'। একখানা নাটক। এই নাটক রচনার পিছনেও আছে একটু সরস নাটকীয় ঘটনা। বলছি।

সাত

'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সাল দেখতে দেখতে মাইকেল মধুসূদন গৌরদাস বসাককে বললেন—ত্যাখো, কী দুঃখের কথা, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করছেন !

গৌরদাস বসাক বললেন—নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তা আমরাও জানি। কিন্তু উপায় কী ? 'বিদ্যাসুন্দরে'র মতো নাটক আমরা অভিনয় করি, এটা নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছে নয়। ভালো নাটক পেলে আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করতাম না, কিন্তু বাঙলা ভাষায় ভালো নাটক কোথায় ?

বাঙলা ভাষায় ভালো নাটক ?—মধুসূদন বললেন—আচ্ছা, আমি রচনা করবো।

কিছুদিন আগে ভূদেব আর মধুসূদন হুগলী নর্মাল স্কুলের শিক্ষকতার জন্যে একটি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পর বাইরে এসে মধুসূদন ভূদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ভাই, 'পৃথিবী' কথাটার বানান কী ?

ভূদেব বানানটি যথাযথ বলেছিলেন।

শুনে মধুসূদন সাহেবী ঢঙে বললেন oh no, it must be—প্র—থি—বী।

এই হ'লো গিয়ে মধুসূদনের তখনকার বাঙলা ভাষায় জ্ঞানের নমুনা। এই মধুসূদন বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা করবেন, ভালো নাটক ?

গৌরদাস বসাক হেসে উঠলেন। বললেন—ভালো। ইচ্ছে হ'লে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।

মুখে যাই বলুন, গৌরদাস ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে মধুসূদনের পক্ষে বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা সম্ভব।

মধুসূদন কিন্তু পরদিনই এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী থেকে খানকয়েক বাঙলা বই আর সংস্কৃত নাটক জোগাড় ক'রে এনে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলেন। .গৌরদাসকে যা বলা হয়েছে তা শুধু কথার কথা নয়। মধুসূদন বাঙলা ভাষায় ভালো নাটক রচনায় বদ্ধপরিকর।

গৌরদাস যা কখনো কল্পনা কবেননি, তাই হ'লো। কয়েকদিন বাদে মধুসূদন গৌবদাসকে দেখতে দিলেন 'শর্মিষ্ঠা'ব পাণ্ডুলিপির খানিকটা। বাঙলা নাটক! গৌরদাস বিস্মিত। মধুসূদন বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা করছেন, এব চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কী হ'তে পারে?

রাজা প্রতাপচন্দ্র রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন—এঁরাও সবিস্ময়ে দেখলেন পাণ্ডুলিপিটি। মুগ্ধ হ'য়ে সবাই উৎসাহ দিলেন মধুসূদনকে। আর বিলম্ব হ'লো না, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হ'লো 'শর্মিষ্ঠা'।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত্। কাব্য-নাটক সম্পর্কে তাঁর মতামত বলতে গেলে সর্বাগ্রগণ্য। সংশোধনের জন্যে তাঁকেই দেওয়া হ'লো 'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু খানিক দেখেই তিনি পাণ্ডুলিপিটি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—সংস্কৃত রীতি অনুসারে এ নাটকই হয়নি। কাটকুট করলে রচনাটি পুরোপুরিই নষ্ট হবে, এ সংশোধনের আমার ইচ্ছে

নেই। বোধ হয় এটি কোনো ইংরেজি-জানা নব্যবাবুর রচনা।

তর্কবাগীশ মশাই খুব ভুল বলেন নি। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই 'শর্মিষ্ঠা' একজন ইংরেজি-জানা বাবুর রচনা।

কেউ-কেউ তখন প্রখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম তুললেন। মধুসূদন একজন নতুন লেখক। নবীন লেখকের রচনা একজন প্রবীণ লেখক দেখে দিলে ভালো হবারই তো কথা।

অতঃপর 'শর্মিষ্ঠা' গেলো রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে। ব্যাকরণের দোষ যদি কিছু থাকে, মধুসূদন কেবলমাত্র সেগুলো শুদ্ধ করার অনুরোধ জানালেন রামনারায়ণকে। কিন্তু পরিবর্জিত হ'য়ে 'শর্মিষ্ঠা' যখন মধুসূদনের কাছে এলো, মধুসূদন খুশি হ'তে পারলেন না। নাটকের বাক্যও রামনারায়ণ ঢেলে সাজবেন—মধুসূদনের কখনো এমন ইচ্ছে ছিলো না। যা করবার তা মধুসূদন নিজের ক্ষমতায়ই করবেন। তাছাড়া মনের দিক থেকে, মধুসূদনের বিশ্বাস, রামনারায়ণের সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্যে রামনারায়ণ যা ক'রে দিয়েছেন, মধুসূদন তার কিছুই রাখবেন না। না, কিছু-কিছু রাখবেন। কিছু-কিছু, কিন্তু সবকিছু নয়।

এক-আধটুতে আপত্তি নেই, কিন্তু পুরোপুরি অদল-বদলই যদি করতে হয়, তার চেয়ে মধুসূদন বরং 'শর্মিষ্ঠা' আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র—এঁরা দু-জনেই 'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পড়েছেন। দু-জনেই খুব খুশি হয়েছেন। এই তো উপযুক্ত নাটক। এ-নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের সম্পূর্ণ যোগ্য।

মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে রাজারা তারপর 'শর্মিষ্ঠা'

ছাপালেন। ১৮৫৮ সালের গোড়ার দিকে 'শর্মিষ্ঠা' বই হ'য়ে বেরোলো।

আর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে 'শর্মিষ্ঠা' অভিনীত হ'লো ১৮৫৯ সালের ৩-সেপ্টেম্বর।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় দেখে হিন্দু কলেজের রামচন্দ্র মিত্র আনন্দে অধীর হ'য়ে এসে মধুসূদনের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—মধু, সত্যি-সত্যি তোমার কৃতিত্ব অসাধারণ। চমৎকার হয়েছে মধু, চমৎকার।

'শর্মিষ্ঠা'র সাফল্যে মুগ্ধ হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। অতঃপর তাঁদের অনুরোধে মধুসূদন রচনা করলেন দু'খানি প্রহসনএকেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

কিন্তু যে-অমিত্রাক্ষর ছন্দ এনে মধুসূদন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তার সূচনা হয় একদিন সন্ধ্যায়, বেলগাছিয়ায়। কথায়-কথায় মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে বললেন—অমিত্রচ্ছন্দ না হ'লে বাঙলা নাটকের উন্নতির কোনো আশা নেই।

যতীন্দ্রমোহন বললেন—আমার মনে হয় না যে বাঙলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অসম্ভব।

কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়ে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না।

যতীন্দ্রমোহন বললেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাটি আপনার মনে আছে কি?

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভ'রে খাই।

মধুসূদন বললেন—বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত লিখতে পারেননি ব'লে আর কেউ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে পারবেন না, এটা কোনো যুক্তি নয়।

যতীন্দ্রমোহন তখন ফরাসী ভাষার নজির দেখালেন। ফরাসী ভাষায়, যতীন্দ্রমোহনের ধারণা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোনো কাব্যগ্রন্থ নেই। ফরাসীভাষা নিঃসন্দেহে শক্তিশালিনী। সেই ভাষায় হ'লো না, বাঙলা ভাষায় হবে?

মধুসূদন বললেন—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি তুলনাবিহীন।

যতীন্দ্রমোহন সেকথা অস্বীকার করলেন না। কিন্তু জননী বলশালিনী হ'লে কি হবে, যতীন্দ্রমোহনের অনুমান, জননীর দুহিতাটি এখনো নিতান্ত দুর্বলা।

—ভুল, ভুল।—মধুসূদন হাসলেন—যদি কয়েকদিনের মধ্যে আপনাব ভুল ভেঙে দিতে না পারি, আমাকে যা খুশি তাই বলবেন। আর যদি আপনাকে দেখাতে পারি যে বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে…

—তাহলে আপনার সে-বই ছাপানোর সমস্ত ব্যয় আমি বহন করবো। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করবো।

মধুসূদন হাততালি দিয়ে উঠলেন।

তিন চারদিনের মধ্যেই মধুসূদনের কাছ থেকে যতীন্দ্রমোহন পেলেন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের পাণ্ডুলিপি। প'ড়ে বিমুগ্ধ হলেন যতীন্দ্রমোহন। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়কে দেখালেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হ'তে চলেছে বাঙলাকাব্য, পূর্ণ হয়েছে মধুসূদনের প্রতিশ্রুতি।

দিনকয়েক পরে বেলগাছিয়ায় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে মধুসূদনের

আবার দেখা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সেই কাব্যাংশের প্রসঙ্গ তুললেন মধুসূদন। জিজ্ঞেস করলেন- কেমন লাগলো ?

যতীন্দ্রমোহন বললেন—আপনি বাজি জিতেছেন। আপনার কাছে আমি হার মানলাম।

অতঃপর আর বিলম্ব হ'লো না। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা অত্যল্প কালের মধ্যেই মধুসূদন সমাপ্ত করলেন।

বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানা কবি উপহার দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহনকে। এই পাণ্ডুলিপি মধুসূদন স্বহস্তে উপহার দিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন হাত বাড়িয়ে উপহার নিচ্ছেন--এমনি একখানা ফটোও তুলেছিলো ফটোগ্রাফার রিণেক কোম্পানি।

এই পাণ্ডুলিপিখানা যতীন্দ্রমোহন আমৃত্যু পরম যত্নের সঙ্গে রেখেছেন। একটি বাক্সের মধ্যে রেখেছিলেন। উৎসাহী মানুষদের দেখাতেন। কখনো হাতছাড়া করেননি, সবসময় চোখে-চোখে রাখতেন। এই ঐশ্বর্যের প্রতি যতীন্দ্রমোহনের অনুরাগের অন্ত ছিলো না।

তারপর 'মেঘনাদবধ কাব্য'। দুইখণ্ডে প্রকাশিত হ'লো ১৮৬১ সালে। প্রথম থেকে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত একখণ্ড, ষষ্ঠ থেকে নবম সর্গ পর্যন্ত আরেক খণ্ড। গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দিগম্বর মিত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন মধুসূদন। কিন্তু এই দিগম্বর মিত্রের ঔদাসীন্যের ফলেই ইউরোপপ্রবাসকালে মাইকেল বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি বিষম বিরক্ত হয়েছিলেন দিগম্বর মিত্রের প্রতি। তাই 'মেঘনাদবধ

কাব্যে'র তৃতীয় সংস্করণ থেকে উপরোক্ত উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার করলেন মধুসূদন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' নিয়ে দেশব্যাপী উত্তপ্ত আলোচনা। বিবিধ বাদ-প্রতিবাদ। নানারকম সমালোচনা আরম্ভ হ'লো দিগ্বিদিকে। এ গ্রন্থের ভাব ভাষা সুর-ছন্দ কি বাঙালী গ্রহণ করবে? মধুসূদন কি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের জন্যে অমর হ'তে পারবেন?

কিছুদিন আগের কথা। তখনো 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়নি। ছাপা হচ্ছিলো। মাইকেল 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রুফ দেখছিলেন একদিন, এমন সময় বাল্যবন্ধু রাজনারায়ণ বসু এসে উপস্থিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম দু-তিন সর্গের পাণ্ডুলিপি মধুসূদন আগেই রাজনারায়ণকে পড়িয়েছিলেন।

প্রুফ দেখতে দেখতে মধুসূদন রাজনারায়ণকে বললেন—My dear Raj, this will surely make me immortal.

রাজনারায়ণ বললেন—তাতে আর সন্দেহ নেই।

একবছরের মধ্যেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' একহাজার কপি বিক্রী হয়েছে, প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।

'মেঘনাদবধ কাব্য' প'ড়ে একদিন একজন উকিলবাবু মধুসূদনকে ধরলেন। অভিযোগ আছে।

—মশাই, মেঘনাদবধের নরকবর্ণনাটা আপনি মিল্টন থেকে নিয়েছেন।

মধুসূদন হাসলেন। উকিলবাবুকে তক্ষুনি দুখানা নরক বর্ণনা আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দিলেন। একখানা দান্তের লেখা, আরেকখানা মিল্টনের।

তারপর বললেন—শুনলেন? আমি মিল্টন থেকে নিইনি। মিল্টন যেখান থেকে নিয়েছেন, আমিও সেখান থেকেই নিয়েছি।

আরেকদিন মধুসূদন কী একটা কাজে চীনাবাজারে গিয়েছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, চীনাবাজারের মতো রাজ্যে একজন দোকানদার নিবিষ্ট হ'য়ে দোকানের সামনে ব'সে পড়ছে মেঘনাদবধ কাব্য।

দেখে-শুনে মধুসূদনের কৌতূহল হ'লো।

দোকানে ঢুকে তিনি সেই দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন—কী বই পড়ছেন?

--নতুন একখানা কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু মধুসূদন এককথায় উড়িয়ে দিলেন। বাঙলাভাষায় আবার কাব্য আছে নাকি?

—সে কি কথা।—দোকানদার বললেন—এরকম একখানা কাব্যগ্রন্থ নিয়েই তো যে-কোনো ভাষা গর্ব করতে পাবে।

মধুসূদন বললেন—পড়ুন দেখি। আমি শুনি।

মধুসূদনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দোকান-দার। বললেন—মশাই, এ-গ্রন্থের ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন ব'লে আমার মনে হয় না।

মধুসূদন বললেন-- কিন্তু একবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

দোকানদার খানিকটা প'ড়ে শোনালেন। তাবপর মধুসূদন বইখানা তার হাত থেকে নিয়ে খানিক আবৃত্তি করলেন! মুগ্ধ হলেন দোকানদার। মধুসূদনকে জিজ্ঞেস কবলেন—মশায়ের থাকা হয় কোথায়?

সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে মধুসূদন অন্য কথায় চ'লে গেলেন—আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি বাঙলাভাষায় চলবে?

—বাঙলাভাষায় এ এক নতুন জিনিস। আমার মনে হয় এই সবচেয়ে ভালো ছন্দ। চলবে, খুব চলবে।

প্রথমদিকে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও ঘোরতর অপছন্দ করতেন

অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের জন্যে একদিনেই তাঁর মত বদলে গেলো।

দীনবন্ধু সেদিন শ্রীশচন্দ্রকে বললেন—আচ্ছা, তুমি শোনো দেখি, আমি পড়ি।

দীনবন্ধু মেঘনাদবধকাব্য থেকে প'ড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন শ্রীশচন্দ্রকে।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্র ব'লে উঠলেন—আপনি কোন বই পড়ছেন? এ অত্যন্ত সুন্দর, এ তো আর সে-বই ব'লে মনে হচ্ছে না।

পুলিশ-আদালতের কাজ তিনটে-চারটে নাগাদ সেরে মধুসূদন যেতেন পাইকপাড়ায়। সেখানকার রাজাদের সঙ্গে চলতো নানা-রকম আলাপ-আলোচনা। সেখানে ব'সেই মধুসূদন কখনো-কখনো লিখতেন। একদিন বিকেলে লিখতে-লিখতে মধুসূদন হঠাৎ ব'লে উঠলেন—আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হলো, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।

মাইকেল মধুসূদন। তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক? বলে কী। হ'লো কী।

হাসতে-হাসতে মধুসূদন বিশদ হলেন—গেলাসরূপ কোষায়, দুই আউন্স পেগ্‌রূপ গঙ্গাজলে, আচমন-কার্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করতে হবে।

বলা বাহুল্য হবে না, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে-ছিলেন। মধুসূদন সন্ধ্যা-আহ্নিক নির্বিঘ্নেই সেরেছেন।

কাশীরাম দাসের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা ছিলো মাইকেলের। বলতেন—এমন জনপ্রিয় কবি আর কে। ছাখো, তাঁর মহাভারত

সর্বত্র পড়া হচ্ছে,—দোতলা-তেতলায়, দোকানে-গাছতলায়। কাশীরাম দাসের তুল্য কবি আমাদের দেশে নেই।

আর ভারতচন্দ্র? মাইকেল বলতেন—উনি তো বকুলফুলের কবি।

সকলেই জানেন, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রকে তিনশো টাকার গাঁতি দিয়েছিলেন। বহুকাল আগের কথা।

সেই ভারতচন্দ্রও নেই, সেই কৃষ্ণচন্দ্রও নেই। কৃষ্ণনগরের মহারাজা তখন সতীশচন্দ্র। মধুসূদনের পরম বন্ধু।

একদিন ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলো। সতীশচন্দ্র মধুসূদনকে বললেন—এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্রেরই বঙ্গকবিদের মধ্যে প্রধান আসন ছিলো। সে-আসন এখন আপনি কেড়ে নিচ্ছেন।

মধুসূদন বললেন—কিন্তু আপনারা ভারতচন্দ্রকে তিনশো টাকার গাঁতি দিয়েছিলেন, আমাকে কী দেবেন?

—আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো সম্পত্তি থাকতো, সতীশচন্দ্র বললেন—আমি আপনাকে তিরিশ হাজার টাকার জমিদারি দিতাম।

বাহিরে যতো ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু, অন্তরে ততোধিক লম্পট—এমনি এক বৃদ্ধের লোলুপ চরিত্র 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র উপজীব্য। আর ইংরেজি-শেখা পানাসক্ত নব্যবাবুদের অধোগতি নিয়ে রচিত হ'লো 'একেই কি বলে সভ্যতা'। দুখানাই প্রহসন! একদিকে যুবক, অন্যদিকে বৃদ্ধ। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দুই দূষিত স্তরকেই মধুসূদন বাণবিদ্ধ করলেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র নবকুমারের সংলাপ নিয়ে একবার দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হয়। সবিস্তার বলি।

মদে টইটুম্বুর হ'য়ে যুবক নবকুমার গভীর রাত্রে বাড়ি এসেছে। নিজের শয়নগৃহে মস্ত উপদ্রব সুরু করেছে। বহু চেষ্টা ক'রেও তার স্ত্রী এবং বোন নবকুমারকে শান্ত করতে পারলো না। তারপর নেশার ঘোরে নবকুমারের অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা। নবকুমারের মা অবস্থা দেখে বিষম ভয় পেয়ে গেলেন। মেয়েকে পাঠালেন কর্তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে। কর্তা মানে নবকুমারের বাবা। তিনি তখন পাশের ঘরে খেতে বসেছেন, এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। খাওয়া ছেড়ে তখনি ছেলের ঘরে এসে দেখেন, এই অবস্থা। সবই বুঝলেন। ক্রুদ্ধ হ'য়ে কর্তা অশেষ কটুকাটব্য কবলেন গৃহিণীকে আর পুত্রকে। শেষে বললেন—কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক।

নব। —হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।

এখানে নবকুমারের এই উক্তিতেই গিরিশচন্দ্রের আপত্তি—এ কথাটা নবকুমারের পিতার সামনে বলাটা কি ঠিক হয়েছে? আমার বোধ হয় ঠিক হয়নি।

দীনবন্ধু বললেন—এখানে ওটা ঠিকই হয়েছে। নবর নেশাটা প্রায় কেটে এসেছে অথচ একেবারেও কাটেনি এবং ইতিপূর্বে তাদের সভায় 'resolution' 'second' ইত্যাদি শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো। কাজেই কর্তার প্রস্তাব শোনামাত্র ও-রকম উক্তি তার মুখ থেকে স্বতই বেরিয়েছিলো। এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, মাইকেল ব'লেই ও-রকম লিখতে পেরেছিলেন।

ভেবে-চিন্তে দীনবন্ধুর ব্যাখ্যাটিও গিরিশচন্দ্র মেনে নিলেন। শুধু মেনে নিলেন বলি কেন, নবকুমারের ঐ উক্তিটির প্রশংসায়

পঞ্চমুখ হলেন গিরিশচন্দ্র। বলতেন—মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটা শিখেছিলো। আ মরি মরি! Hear! Hear! I second the resolution!

এই পয়ারপ্লাবিত দেশে অমিত্রচ্ছন্দের ঐশ্বর্য দান ক'রেই মধুসূদন ক্ষান্ত হননি, শ্রীরাধার অন্তহীন বিরহের উৎস থেকেও তিনি আহরণ ক'রে এনেছেন চিরকালের মাধুর্য।

—ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পারো? —ভূদেব মুখোপাধ্যায় বললেন একদিন মধুসূদনকে। প্রাণের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা প্রখর হ'য়ে উঠলো। জন্ম নিলো 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'।

'হেক্‌টর-বধ' কাব্যখানা মধুসূদন উৎসর্গ করেছিলেন বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে। সেই সম্পর্কে ভূদেব মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া থেকে একখানা চিঠি লেখেন মধুসূদনকে। চিঠিখানার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি:

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টর বধ কাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনসুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন কালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী

ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম, যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন মধুসূদন একদিন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। দুপুরে খেতে বসবার সময় মধুসূদনের ইচ্ছে হ'লো কোট-পেন্টেলুন ছেড়ে ধুতি-চাদর প'রে খেতে বসবেন। মধুসূদন ভূদেবকে বললেন—আমাকে কাপড় দাও। আমি কাপড় পরে পিঁড়ি পেতে বসে খাবো।

তাই হ'লো। ধুতি-চাদর পরে পিঁড়ি পেতে খেতে বসলেন মাইকেল মধুসূদন। তখন ভূদেব বললেন—ভাই মধু! এই বেশে একখানি 'মেঘনাদবধ কাব্য' হাতে নিলে তোমাকে বেশ মানায়। হ্যাট-কোট পরে তোমায় 'Captive Ladie' নিয়ে বেড়াতে পারো।

কিন্তু হ্যাট-কোট প'রে মধুসূদন কি সাহেব হ'য়ে গেছেন একেবারে ?

দিনদশেকের জন্যে একবার ঢাকা গিয়েছিলেন মাইকেল! ১৮৭১ সালের কথা। ঢাকাবাসীরা পোগোজ স্কুলে সভা ক'রে অভিনন্দন দিলেন মাইকেলকে।

সেই সভায়ই এক ভদ্রলোক বক্তৃতা দিতে উঠে মাইকেলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহাগৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি সাহেব হ'য়ে গিয়েছেন শুনে আমরা ভারি দুঃখিত হই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার ক'রে আমাদের সে-ভ্রম গেলো।

উত্তরে মধুসূদন বললেন—আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হোক, আমি সাহেব হয়েছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হওয়ার পথ বিধাতা রোধ ক'রে রেখেছেন আমি আমার বসবার ও শোবার ঘরে একেকখানা আর্শি রেখে দিয়েছি। আমার মনে সাহেব হওয়ার ইচ্ছা যেই বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো আমি সুদ্ধু বাঙালী নই, আমি বাঙাল, আমার বাড়ি যশোহর।

আট

অমৃতলাল বসু বলেছেন—ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনী' প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও যিনি নব্য বঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?' আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ ; কিন্তু এখানে এক সময় বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম-- রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।

প্রধান তিনজনের মধ্যে রঙ্গলালও একজন। বাস্তবিক, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?' আবৃত্তি ক'রে কোন বাঙালী না উদ্দীপ্ত হয়েছেন ?

ছেলেবেলায় যাত্রাগান শুনতে খুব ভালোবাসতো রঙ্গলাল। সে-সমস্ত গান শুনতে-শুনতে আনন্দে তন্ময় হ'য়ে যেতো—এমন ভালোবাসা। সেই তন্ময়তা নিয়ে একটা ছোটোখাটো অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে গেছে শোনা যায়। একাগ্রচিত্তে চোখ বুজে গান শুনবার কালে একটা জ্বলন্ত বাতি প'ড়ে রঙ্গলালের ঠোঁটের ওপরদিক পুড়ে যায় একবার ; দগ্ধস্থানে গোঁফ ওঠেনি, সেজন্য রঙ্গলাল নাকি চিরকাল গোঁফ কামিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সার্ভিস বুকে সেই

পোড়া চিহ্নটি তাঁর মার্ক অফ আইডেনটিফিকেশান ব'লে উল্লিখিত হ'য়ে আছে।

রঙ্গলালের বিয়েব বছব দু'য়েক বাদে রঙ্গলালের মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর রঙ্গলাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'বে চ'লে এলেন বড়মামার খিদিরপুরের বাড়িতে।

বড়মামার নাম রামকমল মুখোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বড়মামার লাইব্রেরীতে ব'সে পড়াশোনা করতে লাগলেন। তাছাড়া ভূকৈলাসের রাজবাড়ির প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে ব'সেও বই পড়বার সুযোগ পাওয়া গেলো। গ্রন্থপাঠের কোনো সুযোগ রঙ্গলাল ত্যাগ করলেন না।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল—রঙ্গলালের সাহিত্যসাধনার মূলে ভূকৈলাসের এই তিনজন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসাহদাতা।

সাহিত্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন -রঙ্গলালের মনে কিশোরকাল থেকেই এমনি একটি ইচ্ছা লালিত হ'য়ে আছে। ভাগ্যক্রমে রঙ্গলাল যথাকালে পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সান্নিধ্য, তাঁর স্নেহ। সময়ে-সময়ে মামাবাড়ি থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ি চলে যেতেন রঙ্গলাল, সেখানে কাটাতেন মাসাধিক কাল।

ঈশ্বচন্দ্রের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। 'কবির গানে' তখন বাঙলাদেশ পরিপ্লাবিত। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন প্রচুর সম্মান। বিখ্যাত ধনীবা মুক্তহস্তে তাঁকে অর্থসাহায্য ক'রে শ্রদ্ধা জানাতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হলেন রঙ্গলাল। ঈশ্বরচন্দ্র রঙ্গলালের রচনার পক্ষপাতী। রঙ্গলালের বহু রচনা 'প্রভাকরে' বেরিয়েছে।

'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র একবার লিখেছেন—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু,

ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

উনিশ বছরের একজন তরুণ লেখক সম্পর্কে এই হ'লো প্রবীণ কবিবরের উক্তি!

ঈশ্বরচন্দ্রের সূত্রে রঙ্গলাল বহু অভিজাত ব্যক্তির স্নেহভাজন হ'য়ে পড়লেন। ছাতুবাবু ও লাটুবাবু রঙ্গলালকে নিজেদের কবির দলের 'কবি' করে নিলেন। ক্রমে ক্রমে রঙ্গলালের সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেনা-শোনা হ'লো, বন্ধুত্ব হ'লো। রঙ্গলালের গুণমুগ্ধ বন্ধুদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বৌবাজারের উমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রাজেন্দ্র, পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন রঙ্গলাল। একটি উদ্ধৃত করি :

আয় যাদু আয়রে, আয় যাদু আয়রে
আয় কোলে আয় রে।
কেমনে ভুলিয়ে ছিলি অভাগিনি মায় রে!
গোঠে পাঠাইয়ে তোরে, সারাদিন আঁখি ঝোরে,
অবিরত দুগ্ধ ক্ষরে, স্তন ফেটে যায় রে।
ক্ষুধায় আকুলী ব্যাকুলী, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর ধূলি,
কেহ ননী মুখে তুলি, দেয়নি তোমায় রে।

তুমি রে অন্ধের নড়ী, কৃপণের ধন কড়ি,
না দেখিলে এক ঘড়ী, ঘটে ঘোর দায় রে।
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, যুক্ত তব মুখ ইন্দু,
হেরি মম দুঃখসিন্ধু, উথলিত হায় রে।
কহে রঙ্গ চমৎকার, পুত্রস্নেহ যশোদার,
এমন জগতে আব না দেখি কোথায় রে।

সাপ্তাহিক 'সংবাদ বসসাগর'. পত্রিকা প্রথম বেরোয় ১৮৪৯ সালের মার্চের মাঝামাঝি। সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বরে 'সংবাদ রসসাগর' সাপ্তাহিক ছেড়ে বারত্রয়িক হ'লো। ১৮৫০ সালের ১৫ই জুলাই ক্ষেত্রমোহন মারা গেলেন।

তারপর রঙ্গলাল 'সংবাদ রসসাগর' পত্রিকার সম্পাদক হলেন। খিদিরপুর থেকে প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার বেরোতে লাগলো 'সংবাদ রসসাগর'।

১৮৫২ সালের এপ্রিল থেকে রঙ্গলাল পত্রিকাব নাম বদল করলেন। ছিলো 'সংবাদ রসসাগর,' হ'লো 'সংবাদ সাগর'। তা নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখেছেন—আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক।

কিছুকাল দক্ষতার সঙ্গে রঙ্গলাল চালিয়েছেন পত্রিকাটি। তারপর অন্য কাজের জন্যে আর সম্পাদনার ভার বইতে পারেন নি,

ছেড়ে দিয়েছেন। সে-বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা রঙ্গলালের একখানা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদনমিদং। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণী সহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্বক বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যদ্যপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্রপ্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদ পত্র সম্পাদনীয় ব্রতোদ্যাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দা। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিখানা যথোচিত সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত, প্রচারিত হয়েছে ১৮৫৩ সালের ১৬ই জুনের 'সংবাদ প্রভাকরে'।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায়ও রঙ্গলালের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ডাক্তার এফ, জে, মৌয়েট এদেশের কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর একটি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সভাটির নাম—বেথুন সোসাইটি।

নানাবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হ'তো ঐ সভায়।

১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল রাত আটটায় ঐ সভার অধিবেশন বসলো মেডিক্যাল কলেজ ঘরে। সেদিন 'বাঙ্গালা কাব্য' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়লেন রামনগরের হরচন্দ্র দত্ত। তাঁর বিশ্বাস যে বাঙলা কাব্য নিকৃষ্ট, বাঙলা কাব্য অশালীন। প্রবন্ধটির এক জায়গায় আছে—While on this subject, we are compelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets. All their writings and more especially their panchalis or songs, are interlarded with thoughts and expressions grossly indecent.

কৈলাসচন্দ্র বসুও সমর্থন করলেন হরচন্দ্র দত্তকে। হ্যাঁ, বাঙলা কাব্যে এমন কিছু নেই যাতে শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট হ'তে পারেন। বাঙলা কাব্য কুৎসিত অশ্লীলতা ও কুরুচিতে আচ্ছন্ন। বিদ্যাসুন্দর থেকে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে কৈলাসচন্দ্র বাঙলা কাব্যে নিকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত দেখালেন।

কিন্তু বাঙলা কাব্যের নিকৃষ্টতায় বিশ্বাস করেন না, বাঙলা কাব্যকে যথার্থ ভালোবাসেন—এমন বাঙালীও তো আছেন। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তেমনি একজন কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করতে উঠলেন। তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। সভাপতি মশাই প্রস্তাব করলেন—আজ আর থাক, আগামী মাসিক অধিবেশনে হবে।

১৮৫২ সলের ১৩ই মে, মেডিক্যেল কলেজ ঘর, বেথুন সভার অধিবেশন। সেদিন সেখানে রঙ্গলাল পড়লেন তাঁর প্রবন্ধ—বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সবাই শুনলেন বাঙলা কাব্যের সপক্ষে রঙ্গলালের যুক্তিযুক্ত বক্তব্য। 'বাঙ্গালা

কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৮৫২ সালে; এখানাই রঙ্গলালের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ছ'বছর পরে ১৮৫৮ সালে বেরোয় 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ'—রঙ্গলালের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ।

'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' প'ড়ে অনেকজন, বিশেষত ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গলালকে অনুরোধ করলেন একখানি বিশুদ্ধ কাব্য রচনা করতে। টডের রাজস্থান থেকে পদ্মিনীর উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে রঙ্গলাল কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

১৮৫৫ সালের মাঝামাঝি রাজা সত্যচরণ মারা গেলেন। মর্মাহত হলেন রঙ্গলাল। ফলত, অসমাপ্ত অবস্থায় বহুদিন পড়েছিলো পদ্মিনী। পদ্মিনী উপাখ্যান বেরোয় ১৮৫৮ সালে।

'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পর্কসূত্রে রঙ্গলাল শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ছ'মাসের ছুটি নিলেন। তাঁর জায়গায় অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন রঙ্গলাল।

১৮৬০ সালে 'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ক'রে রঙ্গলাল 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' থেকে পুরস্কার পেয়েছেন একশো টাকা। প্রবন্ধের বিচারক তিনজন স্বনামধন্য পুরুষ—রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৬০ সালেই রঙ্গলাল নদীয়া জেলার আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি পেলেন।

ডব্ল্যু ড্যাম্পিয়ার ও তাঁর ছেলে রঙ্গলালকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের অনুগ্রহেই খুব সম্ভব রঙ্গলাল চাকরিটি পেয়েছেন।

তাঁদের সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয়ের মূলে ছোট্ট একটু ঘটনাও আছে ব'লে শোনা যায়।

বাবার অনুমতি না নিয়ে ড্যাম্পিয়ার সাহেবের ছেলে বিয়ে করেছিলেন তাঁদের চেয়ে নিচু ঘরের একটি মেয়েকে। ফলে ড্যাম্পিয়ার সাহেব পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি বিষম বিরক্ত। এত বিরক্ত যে ড্যাম্পিয়ার সাহেব পুত্র কিম্বা পুত্রবধূর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

ড্যাম্পিয়ার সাহেবের একটি নাতি হ'লো। তাতেও অবস্থার কিছু পরিবর্তন হ'লো না।

তখন ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল একদিন দু'পক্ষকেই নেমন্তন্ন করলেন নিজের বাড়িতে। নানারকম কথাবার্তা বলতে-বলতে রাজা একসময়ে ড্যাম্পিয়ারকে বললেন—আপনার নাতিটি ভারি সুন্দর হয়েছে।

ড্যাম্পিয়ার ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন—আমার কোনো নাতি-নাতনী নেই। রাজা বললেন—সে কী। আপনার নাতিটি এখানেই আছে যে।

সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন রঙ্গলাল। তাঁকে একটু ইঙ্গিত করলেন রাজা। সেই ইঙ্গিত পেয়েই রঙ্গলাল সাহেবের নাতিটিকে এনে সাহেবের কোলে দিলেন।

নাতিটিকে দেখে সাহেবের রাগ জুড়িয়ে গেলো। লগ্ন বুঝে সাহেবের পুত্র ও পুত্রবধূকে রঙ্গলাল নিয়ে এলেন সাহেবের সামনে। তাঁরা নতজানু হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুড়ো ড্যাম্পিয়ার সাহেব তাঁদের বুকে তুলে নিলেন।

তারপর রাজা ড্যাম্পিয়ারকে দিলেন রঙ্গলালের যথাযোগ্য পরিচয়। রঙ্গলালকে একটি যোগ্য রাজকার্যে নিয়োগের জন্যে অনুরোধও করলেন।

রঙ্গলাল নদীয়ায় যে সরকারী চাকরিটি পেলেন, সেটি অস্থায়ী। এই চাকরির পরে আবার রঙ্গলাল সরকারী চাকরি পেয়েছেন ১৮৬৩ সালের গোড়ার দিকে—বালেশ্বরে স্পেশ্যাল ডেপুটি কালেক্টর। তা-ও অস্থায়ী চাকরি।

সরকারী চাকরি উপলক্ষে দু'বার বাঘের মুখে পড়েছিলেন রঙ্গলাল। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় দু'বারই বেঁচে গেলেন।

উড়িষ্যায় খাল কাটা হচ্ছে। তাঁবু পড়েছে প্রান্তরে। একরাত্রে তাঁবুর মধ্যে ব'সে গড়গড়া টানছিলেন রঙ্গলাল। সঙ্গের অন্যান্য সবাই তাঁবুর বাইরে রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত। হেনকালে একটি বাঘ উঁকি দিলো তাঁবুর মধ্যে। রঙ্গলাল চিৎকার ক'রে উঠলেন। লোকজন ছুটে এলো, কিন্তু তার আগেই বাঘটি চ'লে গেছে।

আরেকবার সন্ধ্যার পর কয়েকজনের সঙ্গে আলো নিয়ে দামুবহুদায় জমিদার নাগর মিত্র মশায়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন রঙ্গলাল। সেসময়ে ও-জায়গা ছিলো ডাকাতদের এলাকা। পথিকদের হত্যা ক'রে ডাকাতেরা যথাসর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে যেতো। একটা জঙ্গলের কাছাকাছি এসে সবাই সতর্ক হ'য়ে চলতে লাগলো। ডাকাতের ভয়। কিন্তু না, ডাকাত না, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো মস্ত এক বাঘ। আশ্চর্য, বাঘটি কাউকে কিছু বললো না। যেমন এসেছিলো, তেমনি চ'লে গেলো। তখন সবাই মিলে দিলো দৌড়। এক দৌড়ে একেবারে নাগর বাবুর বাড়ি। ছুটতে-ছুটতে এসে রঙ্গলাল সেই বাড়ির সিংহদ্বারেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

রঙ্গলালের দীর্ঘকাল কেটেছে উড়িষ্যায়। পরে রঙ্গলাল স্থায়ী সরকারী চাকুরেও হয়েছেন। তখন রেলপথ এত প্রসারিত হয়নি, যান-বাহনের অসুবিধা, পথ-ঘাট দুর্গম, কষ্টের আর অন্ত নেই। পূজোর সময় বাড়ি আসা সম্ভব হ'তো না। ছোটো মেয়ের বিয়েতে,

বড়ো ছেলের বিয়েতে রঙ্গলাল অনুপস্থিত থেকেছেন। এমন কি বড়ো ভাইয়ের মৃত্যুকালেও রঙ্গলাল বাড়ি আসতে পারেননি। চাকরি!

কিন্তু চাকরি-বাকরির কথা আর থাক। তার চেয়ে বরং সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদে রঙ্গলালের নৈপুণ্যের উল্লেখ করি। ১৮৭৩ সালে মুখার্জিস ম্যাগাজিনে রঙ্গলাল কয়েকটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। একটু নমুনা ঃ

To an unrelenting Maid

Thy face, a full-blown lotus fair ;
Thy eyes, a light blue lily pair ;
Thy teeth are **kunda** blossoms white ;
Thy lips are blooming roses bright ;
Thy person,—**champacs** claim their own ;
O, why thy heart is hard as stone ?

শুধু কি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ? দক্ষতার সঙ্গে রঙ্গলাল আরো বহু অনুবাদ করেছেন—ইংরেজি থেকে বাঙলায়, বাঙলা থেকে ইংরেজিতে, সংস্কৃত ও ওড়িয়া থেকে বাঙলায়। একাধিক ভারতীয় ভাষা রঙ্গলাল আয়ত্ত করেছেন। এমন কি, 'উৎকল দর্পণ' নামে একখানা ওড়িয়া সংবাদপত্রেরও রঙ্গলাল প্রতিষ্ঠাতা। পুরাতত্ত্ব বিষয়েও তাঁর উদ্যম প্রণিধানযোগ্য। হিন্দী কবিতার ছায়া ধ'রে রঙ্গলাল 'রতনচুর' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হবার কথা ; প্রথম পরিচ্ছেদের নাম রস পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম ব্যবহার পরিচ্ছেদ, তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম বৈরাগ্য পরিচ্ছেদ।

ছাপতে দেওয়ার আগে রঙ্গলাল গ্রন্থের প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ

নিতেন সাহিত্যবন্ধুদের কাছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রঙ্গলালকে পরামর্শ দিলেন—'রতনচুর' না ছাপবার। না, 'রতনচুরে'র বিষয়-বস্তুটি রুচিসঙ্গত নয়।

বন্ধুর পরামর্শ রঙ্গলাল মেনে নিয়েছেন, ও-গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। রুচিপ্রসঙ্গে গ্রন্থটীর ভূমিকা থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

এইক্ষণে রুচি রুচি বলিয়া যে একটী কথা উঠিয়াছে তাহাতে অনেকে প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা সকল পাঠ করিয়া ন্যক্কার করিতে পারেন। যদি ন্যাকরা শব্দ ন্যক্কার শব্দের অপভ্রংশ হয়, তবে তাঁহাদিগের ঐ ন্যক্কার ন্যাকরা মাত্র। বাস্তবিক আদিরসে কিছুই মন্দ নাই, তাহা সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যের জীবন,—মনুষ্য তদ্বিরহে থাকিতে পারেন না। তবে অনধিকার প্রয়োগ না হয়, তাহাই···

মাইকেলের সঙ্গে রঙ্গলালের বাল্যকাল থেকে বন্ধুত্ব। মাইকেলের মাকে রঙ্গলাল 'মা' বলতেন। শুধু রঙ্গলাল কেন, রঙ্গলালের ছোটো ভাই হরিমোহনও 'মা' ডাকতেন মাইকেলের মাকে। এই হরিমোহনই পরে কিনেছিলেন মাইকেলের খিদিরপুরের বাড়ি।

বাড়ি কিনে হরিমোহন একবার সেখানে জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছিলেন মাইকেলকে। সন্ধ্যাবেলা মাইকেল সে-বাড়িতে এসে কেঁদে ফেলেছিলেন। স্বর্গগতা মায়ের উদ্দেশে মাইকেল সেদিন সজল চোখে বলেছিলেন—মা! তুমি কোথায়? আজ এসে ছাখো, তোমার যোগ্য পুত্র তোমার বাড়ি কেমন সাজিয়েছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ ক'রে এসে ছাখো। তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কতো কষ্ট দিয়েছি!

রঙ্গলাল আর মাইকেল—ছ'জনেই বাঙলা সাহিত্যের স্বনামধন্য পুরুষ। এঁদের রচনা সম্পর্কে পরস্পরের মতামত আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

রাজনারায়ণ বসুকে মাইকেল একবার লিখেছেন রঙ্গলাল সম্পর্কে—He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve.

আর, মাইকেলের রচনার প্রতি রঙ্গলালের মনোভাব কবি নবীনচন্দ্র সেন কাগজে-কলমে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। 'তিনি মাইকেলের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।'

কিন্তু, নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয় হ'লো কবে এবং কোথায় ?

নবীনচন্দ্র সেন যখন শ্রীক্ষেত্রে বদলি হলেন. তখন তাঁর স্ত্রী আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সেই অবস্থায়ই স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু নবীনচন্দ্র কী করেন। এই অবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কেমন ক'রে···

রঙ্গলাল তখন কটকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় নেই, তবু খবর শুনে রঙ্গলাল উপর্য্যুপরি চিঠি লিখেছেন নবীনচন্দ্রকে। না, কোনো কষ্ট হবে না। রঙ্গলাল সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। উৎকল কবির যোগ্য স্থান। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মহানদীর তীরে সম্মিলন আশায় রঙ্গলাল নবীনচন্দ্রের পথ চেয়ে আছেন।

পথের ব্যবস্থা রঙ্গলালই করেছেন। অনেকখানি পথ পার হ'য়ে যেদিন নবীনচন্দ্র সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন রঙ্গলালের বাড়ি, রঙ্গলালের সেদিন আর আনন্দের অন্ত নেই, শেষ নেই তাঁর আদর-অভ্যর্থনার।

সেদিন রঙ্গলাল আপিসে গেলেন না, ট্রেজারির চাবি পাঠিয়ে দিলেন কালেক্টর সাহেবের কাছে। সমস্তদিন দুই কবির কাটলো সাহিত্য নিয়ে। 'কাঞ্চী কাবেরী' রচনা শেষ হয়েছে. সেটি নবীনচন্দ্রকে আদ্যন্ত শোনালেন রঙ্গলাল।

সেদিন সন্ধ্যার পর রঙ্গলালের বৈঠকখানায় একেবারে জমজমাট কাণ্ড। নবীনচন্দ্র এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করা চাই তো। কটকের উৎকৃষ্ট গায়িকা ও নর্তকীরা জমায়েত হয়েছে রঙ্গলালের বৈঠকখানায়।

প্রথমে নাচ। তারপর গান আরম্ভ হ'লো। রঙ্গলালের প্রচণ্ড উদ্যম উৎসাহ।

বাত দুটো। নবীনচন্দ্র আর জেগে থাকতে পারেন না. কিন্তু রঙ্গলাল ওখানে থাকতে নবীনচন্দ্রের সাধ্য কি যে একটু ঘুমোন। নবীনচন্দ্র সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

একবার দেখেন গানে রঙ্গলাল একেবারে আত্মহারা হ'য়ে আছেন। সেই ফাঁকে নবীনচন্দ্র চুপে-চুপে স'রে গেলেন. পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু চুপে-চুপে গিয়ে শুয়ে পড়লেই কী আর পার পাওয়া যায়। ব্যাপারটি টের পাওয়া মাত্র রঙ্গলাল গিয়ে নবানচন্দ্রকে একেবারে চুরির আসামীর মতো টেনে আনলেন। বললেন—নাতি! আমার এত বয়স, আর আমি এ আমোদ করছি, আর তুই ছোঁড়া নতুন রসিক, ঘুমোতে গিয়েছিস।

রঙ্গলাল নর্তকী ও গায়িকাদের মুঠো-মুঠো টাকা দিলেন।

অনেক বলা-কওয়াতে রাত তিনটের সময় গান বন্ধ হ'লো। রঙ্গলাল আর নবীনচন্দ্র—দু'জনে পাশাপাশি দুই পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু ভোর হ'তে না হ'তেই রঙ্গলাল উঠে বাগানে গিয়েছেন এবং ঘনঘন নবীনচন্দ্রকে ডেকে গান গাইছেন -

রাই জাগো! রাই জাগো! শারি শুক বলে,
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে!

গান শুনে নবীনচন্দ্রও ঘুম ছেড়ে উঠে বাগানে গেলেন। রঙ্গলাল নবীনচন্দ্রের মুখখানি ধ'রে সে গান গাইতে লাগলেন।

রঙ্গলালের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, রঙ্গলাল রাত তিনটে পর্যন্ত জেগেছেন। তবু, নবীনচন্দ্র দেখলেন, শান্ত সৌম্য সমুজ্জ্বল আনন্দময় রঙ্গলালকে। বৃদ্ধবয়সে এতখানি রাত্রিজাগরণ সত্ত্বেও রঙ্গলালের মুখে অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই।

নয়

ছেলেবেলা থেকেই কাব্যচর্চায় উৎসাহী নবীনচন্দ্র। চট্টগ্রামের ছেলে। কলকাতায় চ'লে এলো কলেজে পড়বার জন্যে।

কলকাতায় এসেও নবীনচন্দ্রের কাব্যচর্চা থামলো না। ঘরেই হোক, ক্লাশেই হোক, একটু সময় পেলেই হ'লো—লেখা। তবে ক্লাশের মধ্যে একটু ভয়ে-ভয়ে লিখতে হ'তো। চাটগেঁয়ে বাঙাল কবিতা লিখছে টের পেলে ক্লাশের কলকাত্তাই ছেলেরা কি নবীনকে আস্ত রাখবে!

কিন্তু একদিন তারক জোর ক'রে দেখে ফেললো। পড়লো। তারপর নবীনের গালে ছোট্ট একটু চড় মেরে বললো—হাঁ রে বাঙাল, তোর পেটে এত বিদ্যে আছে, আমি তো জানতাম না। এ তো বেশ হয়েছে। তুই লিখতে অভ্যেস কর।

মহোৎসাহে তারক কবিতাটি ক্লাসের অন্য ছেলেদের প'ড়ে শোনাতে চাইল। কিন্তু নবীনের তাতে ঘোরতর আপত্তি। তারকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নবীন ছিঁড়ে ফেললো কবিতাটি।

তবু ব্যাপাটা জানাজানি হ'য়ে গেলো। শুনে ক্লাশের ইয়ারের দল তো হেসে অস্থির। হুঁ, বাঙাল লিখেছে কবিতা!

কিন্তু কবিতা কি নবীন আজ নতুন লিখেছে। সেই ইস্কুলের ছাত্র ছিলো যখন, তখন থেকে লিখছে। পণ্ডিতমশাই বড়ো ভালোবাসতেন নবীনকে। বলতেন—ছন্দ-মিল তো থাকবেই,

তাছাড়া সোজা সরল খোলা-মেলা অর্থও থাকা চাই কবিতার। শুধু কানে নয়, প্রাণেও যেন কবিতা স্পর্শ রাখে।

ভারি রসিক ছিলেন পণ্ডিতমশাই। সে-বছর প্রচণ্ড গ্রীষ্মবর্ণনা প্রসঙ্গে গুপ্তজা এক জায়গায় লিখলেন—দে জল দে জল বাবা! দে জল দে জল।

গ্রীষ্মের মতো বিপুল বিক্রমে বর্ষাও এলো সেবার। পক্ষকাল অবধি চন্দ্র-সূর্য অদৃশ্য, বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত ধারায়, পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে জল-স্রোতে। গুপ্তজার সেই জল-প্রার্থনার জবাবে পণ্ডিতমশাই তখন এক লাইন লিখেছিলেন—খা জল, খা জল বাবা! যত পেটে ধরে।

এই পণ্ডিতমশায়ের কাছে দীক্ষার পরে নবীন যে-কবিতাটি লিখলো, তা নিয়ে পণ্ডিতমশাই একটা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে ফেললেন। ইস্কুল তোলপাড়, কিন্তু তার থেকেও বড়ো ব্যাপার হ'লো বাড়িতে, আরেক বিকেলবেলায়।

কাছারী থেকে ফিরে এসে বাবা একদিন নবীনকে বললেন—নবীনবাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

নবীনবাবু মানে নবীনকৃষ্ণ পালিত। সাবজজ্। তিনি নবীনকে দেখতে চাইছেন কেন?

আর কেন, পণ্ডিতমশায়ের কাণ্ড। সাবজজবাবুদের এক সভায় পণ্ডিতমশাই নবীনের সেই কবিতাটি পাঠ করেছেন। সেই কবিতার দৌলতে নবীনের খ্যাতি সভা থেকে জজ-আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবীনকৃষ্ণ নবীন-কবিকে দেখতে চেয়েছেন।

সেই বিকেলেই বেহারারা বাবার তাঞ্জামে চাপিয়ে নবীনকে সটান নিয়ে এলো নবীনকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা তখন সরগরম। ভারিক্কি ভদ্রলোকেরা ব'সে আছেন। পণ্ডিতমশাইও আছেন।

নবীনকৃষ্ণ বাবু নবীন-কবিকে টেনে নিলেন, মুখচুম্বন করলেন। সেই কবিতাটি পড়তে বললেন।

ভয়ে-ভয়ে নবীন পড়লো। শুনে সভাস্থ সবাই ধন্য-ধন্য করলেন।

নবীনকৃষ্ণ বাবু নবীন কবিকে ডাকতেন মিতা।

তারপর থেকে নবীন প্রচণ্ড উৎসাহে কবিতা লিখেছে। ইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার একেকটি কবিতা লিখেছে নিয়মিত। একবার, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন, এক কবিতায় লিখেছিলো

মুসলমানগণ ছুরি নিয়া হাতে,
বিস্‌মল্লা স্মরিয়া দেয় গরুর কল্লাতে।

পণ্ডিতমশাই এ-কবিতা গম্ভীরভাবে শুনিয়েছিলেন মুন্সী সাহেবকে। মুন্সীসাহেব নবীনের ওপর চ'টে আগুন একেবারে। বলেছিলেন—নবীন মহাপাপী। চন্দ্রাদিত্যব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করলেও এ-পাপ ক্ষালন হবে না।

যাক গে। যে কথা হচ্ছিলো।

কলেজ থেকে একদিন দুপুরে নবীন ঘরে ফিরেছে। ঘরে ফিরে দেখে, আরেকজন আছেন। ইনি একজন মেডিক্যাল ছাত্র! দিগ্‌গজ ব্রাহ্ম। হয়তো এই পটাস-পটাস ক'রে পড়ছেন, এই চোখ বুজে হা-নাথ ব'লে ধ্যানস্থ হচ্ছেন।

নবীন ঘরের একদিকে পড়তে বসলো। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ব্রাহ্মভায়ার অবস্থা দেখে পড়া বন্ধ করতে হ'লো।

ব্রাহ্মভায়ার একখানা আধ্যাত্মিক ডায়েরি আছে। ব্রাহ্মভায়ার প্রাণে কী ভাব উঠেছে কে জানে, উনি সেই মূল্যবান বস্তুখানা একবার খুলছেন, একবার পড়ছেন, একবার বাঁধছেন। থেকে-

থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। চোখ ছলছল। মুখ গম্ভীর। কেন? নবীন ভাবলো, বোধ হয় ব্রহ্মচিন্তায়। আবার ভাবছেন, আবার পড়ছেন।

দেখেশুনে নবীন পড়া ছেড়ে উঠলো। ব্রাহ্মভায়ার গলা জড়িয়ে বললো—তুমি এত তদ্‌গত-চিত্তে কী পড়ছো?

ভায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন—কিছুই না।

—কিছুই না? প্রকাণ্ড ডায়েরি সামনে, তোমার এই ভাব?

ব্রাহ্মভায়া বললো—তোমাকে বললে তুমি ঠাট্টা করবে। নবীনও নাছোড়—কী কথাটা বলো না।

নীরবে সেই শ্রীরামপুরী কাগজের ডায়েরির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ব্রাহ্মভায়া। বললেন—সত্যি-সত্যি ঠাট্টা করবে না তো। তোমার পেটে কথা থাকে না। তুমি সকলকে ব'লে ফেলবে!

সঙ্গে-সঙ্গে নবীন মুখ গম্ভীর ক'রে ফেললো। বললো—তুমি আমাকে এমন পাপিষ্ঠ মনে করো যে, আমি একটা এমন সিরিয়স ম্যাটার নিয়ে ঠাট্টা করবো, এবং তুমি নিষেধ করলেও অন্যের কাছে বলবো?

তখন ব্রাহ্মভায়া ডায়েরিখানা নবীনকে দিলেন। বললেন—তবে বেশ স্থিরভাবে পড়ো।

নবীন পড়তে লাগলো। অনেক দামী-দামী কথা আছে ডায়েরিখানায়। যথা—পরম কারুণিক পরমেশ্বর, পাপ, তাপ, পরিতাপ, অনুতাপ, ভ্রাতা, ভগিনী, পবিত্র প্রেম, বিধবার উদ্ধার, কুসংস্কার রাক্ষস, নির্মল দেশাচার, দেশের নরপিশাচ কুসংস্কারাপন্ন আলোক-বিহীন নরাধমগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব তো যেমন-তেমন। ডায়েরির চার পৃষ্ঠার সারমর্মটুকুই

মর্মান্তিক। উক্ত ব্রাহ্মভায়া তার ভগ্নীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একটি বিধবা ঝি দর্শন করেছেন; এবং সেই অবধি ভ্রাতৃভাবে দেশাচার-রাক্ষসের কবল থেকে হতভাগিনীকে উদ্ধার করবার জন্যে অধীর হ'য়ে পড়েছেন।

হাসির দমকে পেট ফেটে যাবার দাখিল, কিন্তু বহুকষ্টে নবীন হাসি চেপে রাখলো। গম্ভীর মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে বললো—এ প্যাথেটিক স্টোরি।

ব্রাহ্মভায়া বললো—বড়ো—শোচনীয়, না?

—বড়ো!

কিন্তু রগড়টা, নবীন মনে-মনে ভাবলো, আরো একটু পাকাতে হবে। অতএব ব্রাহ্মভায়াকে বললো—তুমি যদি বলো, আমি একটা কবিতা লিখবো।

প্রস্তাব শুনে ব্রাহ্মভায়া গম্ভীব স্বরে বললো—আমি বড়ো সুখী হবো।

ব্যস্, আর পায় কে। আধঘণ্টার মধ্যে নবীন একটা কবিতা লিখে ফেললো। কবিতাটির নাম—কোনও এক বিধবা কামিনীর প্রতি।

কবিতাটি শুনে ব্রাহ্মভায়া একেবারে বিগলিত হলেন।—কী চমৎকার! কী চমৎকার! তুমি অবিকল আমার হৃদয়ের কথাগুলো লিখেছো।

হেনকালে বেলঘরিয়ার পাগলা উমেশ এসে উপস্থিত। আদ্যন্ত কাহিনী শুনে উমেশ তারপর কবিতাটি দেখলো, সুন্দর গলায় সুর ক'রে পড়লো। আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে রইলো নবীনের দিকে। বললো—হ্যাঁ রে পাগলা, তোকে এতদিন আমি চিনিনি। তুই যে একটি জিনিয়স।

একে-একে অন্য ছাত্রেরা কলেজ থেকে ফিরে এলো, সবাই একেকবার পড়লো কবিতাটি। হুলুস্থুল কাণ্ড। বেশ চলছিলো, কিন্তু সব ভণ্ডুল ক'রে দিলো চন্দ্রকুমার। সেই ব্রাহ্মভায়াকে চন্দ্রকুমার ব'লে ফেললো—বটে? এই তোমার ব্রাহ্মধর্ম?

ধর্ম নিয়ে টানাটানি, ধর্মের ওপর আঘাত? রাগের মাথায় ব্রাহ্মভায়া ললিত-ভৈরবে গালাগাল দিতে লাগলো নবীনকে। যেন যতো দোষ নবীনের।

নবীন আর কী করে কবিতাটি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড-খণ্ড ক'রে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলো।

দুয়েকজন ছাড়া সবাই অনুযোগ তুললো তখন। ছিঁড়ে ফেলবার কী হয়েছে? উমেশ ধ'রে পড়লো, কবিতাটি আবার লিখতে হবে।

না। লিখবে না। ব্রাহ্মভায়াটি না বললে নবীন কিছুতেই লিখবে না।

কিন্তু ব্রাহ্মভায়া আরেকদিকে একখানা মেডিক্যাল বই নিয়ে তন্ময় হ'য়ে আছে। তাকে নিয়ে পড়লো উমেশ। অনেক অনুনয়ের পর মেডিক্যাল বই থেকে চোখ না তুলে ব্রাহ্মভায়া বললো—আমার আপত্তি নেই।

কবিতাটি প্রায় মুখস্থই হ'য়ে গিয়েছিলো। নবীন তক্ষুনি আবার লিখে ফেললো। সেটা নিয়ে চলে গেলো উমেশ।

সেই কবিতাটি প'ড়ে নবীনকে দেখতে এলো সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র, একজন কিশোর কবি—শিবনাথ ভট্টাচার্য। এলো পরদিন কলেজের পর, উমেশের সঙ্গে।

অনেক আলাপচারি হ'লো শিবনাথের সঙ্গে। কিন্তু আসল কথাটা কী? সেটা উমেশ আর শিবনাথ সাব্যস্ত ক'রে ফেলেছে।

নবীনের সেই কবিতাটি ওরা ছাপাতে দেবে -এডুকেশন গেজেটে।

সে কী কথা। কবিতা ছাপার অক্ষরে কাগজে উঠবে! এত বড়ো সম্মান! এত বৃহৎ ব্যাপার! লুকিয়ে-লুকিয়ে যে-কবিতা লেখেঁ তা ছাপা হবে লোকে পড়বে এমন কথা কি নবীন কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে? ভাবেনি।

নবীনের একেবারে হৃৎকম্পের দশা।

এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক তখন প্যারীচরণ সরকার, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক। তিনি একদিন এলেন নবীনদের ক্লাশে। জিজ্ঞেস করলেন—নবীন সেন কার নাম?

নবীন উঠে দাঁড়ালো।

প্যারীচরণ বললেন—উমেশ, শিবনাথ আমাকে যে-কবিতাটি দিয়েছে ওটি কি তোমার লেখা?

নবীন মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

প্যারীচরণ বললেন—তোমার বেশ শক্তি আছে। তুমি অনুশীলন করো। তুমি সর্বদা এডুকেশন গেজেটে লিখবে।

ক্লাশের সব কটি বিস্মিত চোখ তখন নবীনের ওপর নিবদ্ধ।

যথাসময়ে যথাস্থানে বেরোলো কবিতাটি। কেউ-কেউ খুব উৎসাহ দিলো নবীনকে, কিন্তু ইয়ারের দল শনির মতো লেগে রইলো নবীনের পিছনে। তাদের মুখে নানা ঢঙে উচ্চারিত হ'তে লাগলো পূর্ববঙ্গের কবিতা। দুর্গতির একশেষ।

শুনে ক্লাশের বাঙাল ছাত্রেরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। নবীনকে জিজ্ঞেস করলো- এ হালারা বলছিলো কী?

আসল কথা চেপে গিয়ে নবীন বললো—খুব প্রশংসা করছিলো।

সেকথা তারা বিশ্বাস করলে না। মুরুব্বীর ভঙ্গিতে একটু হেসে বললো--তুমি fool তাই এ হালাদের কথায় বিশ্বাস করো। যাহা কিছু বলছে, সব maliciously.।

দশ

—গন্ধ, গন্ধ !

সমবয়স্ক বালকদের বিদ্রূপে অস্থির হ'য়ে উঠলো চৌবেড়িয়া গ্রামের একটি ছেলে। তার পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ, কিন্তু সমবয়সীরা সে-নাম ছেঁটে নিয়েছে। তারা বলে—থু-থু, গন্ধ, গন্ধ !

গন্ধর্বনারায়ণের মা তাদের বলতেন তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে।

গন্ধর্বনারায়ণের বাবার নাম কালাচাঁদ। সামান্য উপার্জন কালাচাঁদের, কায়ক্লেশে তিনি সংসার চালান। গ্রামের পাঠশালায় ছেলেকে সামান্য একটু জমিদারী হিসেব-পত্র শিখিয়ে অল্প বয়সেই কাজে লাগিয়ে দিলেন। সামান্যই আয় হ'তো গন্ধর্বনারায়ণের, কিন্তু সেটুকুতেই, কালাচাঁদ মনে করতেন, সংসারের অসামান্য উপকার হচ্ছে।

গন্ধর্বনারায়ণের এসব আয়-আদায়ের দিকে চোখ নেই, তার মন প'ড়ে আছে বিদ্যাচর্চার দিকে। অথচ কালাচাঁদ নিরুপায়। উপায় কি ?

গন্ধর্বনারায়ণ বাবাকে কিছু না ব'লে বাড়ি থেকে পালালো। পালিয়ে এলো কলকাতায়। কলকাতায় আশ্রয় পেলো এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করলো। জীবনের আরম্ভে কতো কষ্ট যে গেছে !

কলকাতায় স্কুলে ভর্তি হবার সময় নিজের নাম নিজেই বদলে নিলো। গন্ধর্বনারায়ণ উড়ে গেলো, জুড়ে রইলো দীনবন্ধু।

গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র নয়। দীনবন্ধু মিত্র।

কলকাতায় থেকে পড়াশোনার জন্যে কতো কষ্ট করতে হয়েছে দীনবন্ধুকে। নিজের হাতে রান্না ক'রে খাইয়ে অন্যের বাড়িতে থাকতে হয়েছে।

দিনের পর দিন কেটেছে। তারপর দীনবন্ধু যথাসময়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিতে ঢুকলেন। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

একদিন রাত্রে মেঘনা পার হচ্ছেন দীনবন্ধু। নৌকোর মধ্যে ব'সে লিখছেন নীল-দর্পণ নাটক।

নৌকো চলছে। কিন্তু হঠাৎ ঘটলো এক বিঘটন। নৌকো ডুবতে আরম্ভ করলো। উপায়ান্তর নেই দেখে নৌকোর মাঝিরা লাফিয়ে পড়লো জলে, কিন্তু দীনবন্ধু সাঁতার জানেন না। সব বুঝি যায়!

হঠাৎ কার পায়ে যেন মাটি ঠেকলো। ওরে ভয় নেই, এখানে জল অল্প, নিকটে নিশ্চয়ই চর আছে।

সত্যিই তাই। সকলে মিলে নৌকোখানা টেনে নিয়ে এলো সেই চরে, দীনবন্ধু ব'সে রইলেন নৌকোর ছাদের উপর, হাতে তাঁর নীল-দর্পণের ভিজে পাণ্ডুলিপি।

মেঘনা নদী, নিবিড় অন্ধকার, গভীর রাত্রি, মাঝে-মাঝে নিশাচর পাখির চিৎকার। এখন তো নদীতে ভাঁটা, কিন্তু খানিক বাদেই যখন জোয়ার আসবে, এই চর ডুবে যাবে অতলে, তখন এই ভাঙা নৌকো কোথায় থাকবে?

এই বোধহয় শেষ। মেঘনার জলেই বোধ হয় শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে। দীনবন্ধু ভাবলেন।

অকস্মাৎ দূরে শোনা গেলো দাঁড়ের শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে উচ্চকণ্ঠে সবাই ডাক পাঠালো। সে-যাত্রা তাদের দৌলতেই সবাই

রক্ষা পেয়েছেন। দীনবন্ধু বেঁচেছেন, দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ বেঁচেছে। 'নীল-দর্পণ' ছাপা হয় ঢাকার একটি ছাপাখানায়। দীনবন্ধু তখন ঢাকায় ডাকঘরের ইন্‌স্পেক্টর। ঢাকার সরকারী ডাক্তার দুর্গাদাস কর দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাত নটা-দশটা নাগাদ দুর্গাদাসের বাড়িতে চ'লে আসতেন দীনবন্ধু। দরোজা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে দুজনে 'নীলদর্পণে'র প্রুফ দেখতেন।

'নীলদর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হ'লো ১৮৬০ সালে। এই নাটকখানি কেন্দ্র ক'রে কী না হয়েছে বাঙলাদেশে। নানাস্থানে অভিনীত হ'য়ে এই নাটক দেশব্যাপী যে আলোড়ন তুলেছে, তা যথার্থই তুলনাবিরল। লক্ষ্ণৌতেও একবার অভিনীত হয়েছে 'নীলদর্পণ'। ভুল বলা হ'লো। শেষপর্যন্ত 'নীলদর্পণ' অভিনীত হ'তে পারেনি সেখানে। সেই ইতিবৃত্ত যথাসাধ্য বর্ণনা করি।

১৮৭৫ সালের শেষের দিকে কলকাতার বিখ্যাত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেরিয়ে পড়লো পশ্চিমের পথে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ-- অভিনয় এবং দেশ-ভ্রমণ।

দলের ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর। দলের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অবিনাশ কর, কার্ত্তিক পাল, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি। বিনোদিনীর মা আবার বিনোদিনীকে একা ছেড়ে দিতেন না। তিনিও চললেন দলের সঙ্গে।

প্রথমেই খুব সম্ভব দিল্লী। দিল্লীতে সাত-আট দিন অভিনয় হয়েছিলো, কিন্তু তেমন জমেনি। দিল্লী থেকে লাহোর। সেখানেও দশ-বারোদিন অভিনয় হয়েছিলো। নাচ-গানের বইই বেশি, অর্ধেন্দুশেখরই জমজমাট ক'রে রেখেছিলেন লাহোরের আসর। লাহোরে একটা কাণ্ড হয়েছিলো বটে বিনোদিনীকে নিয়ে।

'সতী কি কলঙ্কিনী'তে রাধিকা সেজেছিলো বিনোদিনী। সেই

সাজে বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হলেন গোলাপ সিং। মস্ত বড়োলোক, সবাই তাকে 'রাজা' ব'লে ডাকে। তার খেয়াল হ'লো বিনোদিনীকে বিয়ে ক'রে জাতে তুলে নেবেন। গোলাপ সিং প্রস্তাব করলেন।

শুনে তো বিনোদিনীর মা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার ভয় হ'লো, যদি গোলাপ সিং বিনোদিনীকে কেড়ে নেন! সেই জন্যেই কি না কে জানে, তাড়াতাড়ি লাহোর থেকে বিদায় নিয়ে মিরাটে এলো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মাত্র তিনদিন অভিনয় করলো মিরাটে। তারপর আগ্রায়। আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌ। কিন্তু একটা কথা বলতে ভুল হ'য়ে গেলো। লক্ষ্ণৌ যাবার আগে আগ্রা থেকে উটের গাড়ি চেপে একবার বৃন্দাবনধামে গিয়ে গোবিনজী দর্শন ক'রে আসার কথাটাও এখানে বলা উচিত। বৃন্দাবনের এত কাছে এসে গোবিনজী না দেখে যাবার কোনো মানে হয় না। দলের সবাই তাই বলে। শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে একরাত্রি আগ্রায় বিশ্রাম নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার চললো লক্ষ্ণৌ।

আগেই একজন লোক সেখানে গিয়ে দলের জন্যে বাসা ঠিক ক'রে রেখেছে। কিন্তু আসল কাজের খবর কি? থিয়েটার হবে কোথায়? সেসব ঠিক আছে। ম্যানেজার ধর্মদাস সুর ছত্রমঞ্জিলে স্টেজ সাজিয়ে নিলেন। দিব্যি স্টেজ। ঐ স্টেজে অভিনয় করবে কলকাতার বিখ্যাত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মস্ত বড়ো বাড়ির মধ্যে স্টেজ, চারদিকে গ্যাসের আলো, প্রচণ্ড ভিড়, জমজমাট অভিনয়। প্রথমদিন অভিনীত হ'লো 'লীলাবতী'। দ্বিতীয়দিন একখানি অপেরা। তৃতীয়দিন বিশ্রাম।

তারপর 'নীলদর্পণ' নাটক।

সেদিন একেবারে লোকে লোকারণ্য। লক্ষ্ণৌয়ের এন্তার বড়োলোক, দেদার সাহেব এবং বিস্তর মেম এসেছেন 'নীলদর্পণ'

দেখতে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সামনের দিকে কেবল লালমুখ। দর্শকের আসন একেবারে সাহেব-মেমে ভর্তি। প্রোগ্রামও ছাপা হয়েছিলো ইংরেজিতে। সেই সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র কাহিনীটিও মোটামুটি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। উডসাহেব সাজলেন অর্ধেন্দুশেখর, তোরাব মতিলাল সুর এবং রোগসাহেব অবিনাশ কর। অবিনাশ করের চেহারা চমৎকার ; তাঁর স্বভাবও একটু কাট-কাট মার-মার গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। নীলকুঠির সেই নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী সাহেবের ভূমিকায় অবিনাশ কর অপরূপ। একেবারে ষোলো আনা নিখুঁত রোগসাহেব।

যাক অভিনয় তো আরম্ভ হ'লো। ক্রমে-ক্রমে জ'মে উঠলো নাটক। তারপর সেই দৃশ্য —যেখানে ক্ষেত্রমণি কাতর চিৎকার করছে রোগসাহেবের কাছে, 'ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে'...তোরাব ছুটে এসে রোগ-সাহেবের গলা টিপে ধ'রে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ করেছে...

সঙ্গে-সঙ্গে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। দর্শকদের আসন থেকে সাহেবেরা হৈ হৈ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, পেছন থেকে ছুটে এসে সবাই জমায়েত হ'তে লাগলো ফুট-লাইটের কাছে। কতোগুলো লালমুখো তলোয়ার সমেত লাফিয়ে পড়তে চায় স্টেজের ওপর ; তারা এমন উন্মত্ত যে, আর পাঁচজনে পর্যন্ত তাদের ধ'রে রাখতে পারে না।

ড্রপ ফেলে দেওয়া হ'লো। কিন্তু তাতেই কি শেষরক্ষা হবে ? এবার হয়তো সব যাবে, এবার নিশ্চয়ই ওরা এদের দলসুদ্ধ কেটে ফেলবে। সে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা !

অবিলম্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কেল্লা থেকে একদল সৈন্য আনালেন। তখন অবস্থা শান্ত হ'লো খানিকটা।

ম্যাজিষ্ট্রেট অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলেন, ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার ধর্মদাস সুর। পলকে কোথায় তিনি উধাও হলেন কে জানে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাকছেন, অথচ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে। আশ্চর্য, এটুকু সময়ের মধ্যে সুরমশাই নিখোঁজ হ'য়ে গেলেন কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজির পব ম্যানে-জারকে পাওয়া গেলো। সুরমশাই পেছনদিকে স্টেজের নিচে চুপচাপ ব'সে আছেন। তা কার্তিক পাল ওখানেই তাঁকে ধ'রে টানাটানি আরম্ভ কবলেন। কিন্তু টানাটানি করলে হবে কি, সুরমশাই অনড়। না, উনি উঠবেন না। অগত্যা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার অবিনাশবাবু অর্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—এখানে আর অভিনয় ক'রে কাজ নেই। পুলিশ সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিশ পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।

দুর্গানাম জপতে-জপতে মেয়েরা তো গাড়িতে উঠলেন। মেয়েদের গাড়ির পিছে-পিছে অনেক অভিনেতাও এক্কাগাড়িতে এলেন। সিন-ড্রেস ইত্যাদি কিছুই এলো না, সব প'ড়ে রইলো অকুস্থলে, পুলিশের জিম্মায়।

সেইরাত্রে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অনেকের চোখেই ঘুম এলো না। সারারাত কাটলো পরামর্শে। কখন, কেমন ক'রে কলকাতায় ফেরা যায়।

পরদিন সকালে সটান ষ্টেশনে। কিন্তু সিন-ড্রেস ইত্যাদি যে ওখানে প'ড়ে রইলো। ওগুলোর কী দশা হবে?

সেকথায় ম্যানেজার ধর্মদাস স্থুর বললেন—আমি ওখানে আর যাচ্ছি না, সিন-ড্রেস থাক প'ড়ে।

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাঙালীরা সেবার বিস্তর উপকার করেছেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে। ঐ সিন-ড্রেস ইত্যাদি তাঁরাই কুলি পাঠিয়ে আনিয়েছেন, বেঁধে-ছেদে ঠিকঠাক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

একবার দীনবন্ধু কাছাড়ের এক'জোড়া জুতো পাঠিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। লিখেছেন—বঙ্কিম, কেমন জুতো!

বঙ্কিমচন্দ্রও অসামান্য পরিহাসকুশল। তিনিও তিনকথায় উত্তর পাঠালেন দীনবন্ধুকে—তোমার মুখের মতো।

পরিণতবয়সী বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার কথা ছেড়ে দিই, বালক বঙ্কিমের রসিকতাই কি কম তীক্ষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঠাকুমার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কথকতার আসর বসেছে। দশ-বারো বছরের বঙ্কিমচন্দ্র সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বসেছে কথকতা শুনতে। পুরু গালিচা-পাতা চৌকির উপরে কথকঠাকুর ব'সে আছেন। কথকঠাকুরের শরীরটি শুষ্ক কাষ্ঠ, ছোটো-ছোটো চোখ, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে নামাবলী, পিছনে তাকিয়া এবং সামনে একখানা চন্দনচর্চিত পুঁথি। পুরোদমে কথকতা চলছে।

কিন্তু আসল বর্ণনাটাই দেওয়া হ'লো না। কথকঠাকুরের নাকটি মস্ত লম্বা; এমন লম্বা যে মনে হয় নাকের ডগাটি কথকঠাকুরের প্রায় মুখের মধ্যে চ'লে গেছে।

বঙ্কিম সঙ্গীদের বললো—কথকঠাকুরের নাকটা ভারি পেটুক।

মানুষ পেটুক হ'তে পারে, হ'তে পারে কি হামেশাই হচ্ছে,

কিন্তু মানুষের নাক পেটুক—এ আবার কেমন কথা? নাকের আবার পেট আছে নাকি? বঙ্কিম নিজেই অতঃপর বিষয়টি বিস্তারিত করলো—শোন। কথকঠাকুরের নাকটা ঠোঁট ছাড়িয়ে কথক-ঠাকুরের গালের মধ্যে উঁকি মারছে দেখছিস? নাকটা ওরকম মুখের মধ্যে উঁকি মারছে কেন বল তো।

এই উদ্ভট প্রশ্নের কে উত্তর দেবে। বঙ্কিম নিজেই ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ক'রে দিলো—আর কেন, খাবার লোভে। কথকঠাকুর যখন কিছু খান, তখন নাকটা কথকঠাকুরের মুখের ভেতর থেকে খাদ্যবস্তু চুরি ক'রে খায়। বেচারা কথকঠাকুর টেরও পান না। নাকটা ভারি পেটুক।

সমবয়সীরা উঁচুগলায় হেসে উঠলো, বয়স্কেরা ধমক দিলেন তাদের। কিন্তু আশে-পাশের দুয়েকজন বয়স্কের কানে বঙ্কিমের রসিকতাটি বড়ো উপাদেয় লেগেছে। তাদের একজন বললেন—ধমকাবেন না, ধমকাবেন না। বড়ো সরস কথাটা হয়েছে।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি বঙ্কিমকে নাক নিয়ে একটি প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন—কিন্তু এখন তো কথকঠাকুর কিছু খাচ্ছেন না। এখন নাকটা কিসের লোভে কথকঠাকুরের মুখের মধ্যে উঁকি মারছে?

—এখন আর লোভ নয়, এখন অন্য ব্যাপার। -বঙ্কিম হাসতে হাসতে বললো এখন ঐ নাকই আবার কথকঠাকুরকে খাওয়াচ্ছে। এখন ঐ নাকই কথকঠাকুরের মুখের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা সরস নস্য ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু দেখুন ও-বস্তু খেতে অরাজি হ'য়ে কথকঠাকুর ঘনঘন মাথা নাড়ছেন, ঘনঘন গামছা দিয়ে ঠোঁট মুছছেন।

নাকের প্রসঙ্গ যাদের কানে গেলো তাদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত হ'লো প্রবল হাস্যধ্বনি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা পরে হবে।

একবার দীনবন্ধু যশোহর গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন শিশিরকুমার ঘোষ। নানাকথার পর শিশিরকুমার বললেন —দীনবন্ধু, তুমি এবার যদি অমৃতবাজারে পোষ্টাপিস দেখতে যাও, তবে একবার আমার ইস্কুলটি দেখে এসো। দেখে এসো কি কাণ্ড-কারখানা করেছি।

দীনবন্ধু বললেন -কী কাণ্ড-কারখানা?

শিশিরকুমার বললেন -ছেলেদের ড্রিল শেখাচ্ছি।

দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন--এত বন্দুক-সঙীন কোথায় পেলে?

শিশিরকুমার বললেন পাকা বাঁশের লাঠি। যদি এ ভাবে দেশের সমস্ত ইস্কুলে ড্রিল শেখায়, তাহলে তুমি দেখো একটা bloodshed না হ'য়ে যায় না।

Bloodshed শুনে দীনবন্ধু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। বললেন কি? Bloodshed? Menstruation?

ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা সম্মিলিতকণ্ঠে হেসে উঠলেন। কিন্তু শিশিরকুমার হাসলেন না। শিশিরকুমার রেগে গেলেন। বললেন - তোমার কাছে কোনো Serious কথা বলা বৃথা।

দীনবন্ধু পুনরপি বললেন -কিন্তু বাঙ্গালীর রজস্বলা ছাড়া আর bloodshed কী হ'তে পারে?

দীনবন্ধুর পরিহাসনৈপুণ্য তুলনাবিরল। তাঁর পরিহাস যথার্থই তীক্ষ্ণলক্ষ্য; সেই পরিহাস লক্ষ্যের দিকে শরের মতো তন্ময়।

দীনবন্ধু যেখানে উপস্থিত, সেখানেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের অজস্রতা। নিজে হেসে তিনি অপরকে হাসান।

দীনবন্ধু আর বঙ্কিমচন্দ্র দু-জনেই উঁচুদরের সরকারী কর্মচারী।

অথচ দু-জনেই আপিস কিম্বা সাহেব-সুবোর প্রসঙ্গ উঠলে বিরক্তি বোধ করেন।

একদিন রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিমন্ত্রিত হ'য়ে গেছেন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি। বিস্তর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন সেখানে। ডেপুটিতে ডেপুটিতে সে জায়গা আলো কিম্বা বলি অন্ধকার হ'য়ে আছে। ওদেরই একজন মহাগর্বে আসর জাঁকিয়ে আছেন। গর্বের বিষয়-বস্তু কী? না, উনি দিনকয়েক আগে স্বয়ং লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্তা বলেছেন। তারই বর্ণনায় তিনি মুখর।

একসময়ে সেই বর্ণনা শেষ হ'লো কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আর সহ্য হ'লো না। তিনি বলে উঠলেন—

'ধন্য এক জনা হয়েছে,

পেখের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।'

আর, দীনবন্ধুও একবার ঘায়েল করেছেন একজন ডেপুটিকে। একজন ডেপুটি তিনবছরের কাজ দেড় বছরে শেষ করেছেন। বাহবা পেয়েছেন। তাই নিয়ে কী গল্প। কোন কায়দায় জেলায়-জেলায় ঘুরে অল্প সময়ের মধ্যে এই অসাধ্য সাধন করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সেই গল্পই শোনাচ্ছিলেন ডেপুটিবাবু।

ডেপুটিবাবু থামতেই দীনবন্ধু বললেন ওহে, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হ'য়ে লঙ্কা দগ্ধ করেছিলে!

দীনবন্ধুকে বিষম ভয় ডেপুটিবাবুদের। পারতপক্ষে তারা দীনবন্ধুকে এড়িয়ে চলেন। কে জানে কোন কথায় দীনবন্ধুর মুখ থেকে কোন শব্দব্রহ্ম বেরিয়ে আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র আর দীনবন্ধুর একটি কৌতুককর কাহিনী নিবেদন

করি। সত্যি-মিথ্যে হলপ ক'রে বলতে পারি না। এ-কাহিনীর সাক্ষী একজন ভৃত্য।

প্রায়ই আসেন দীনবন্ধু কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে। সেদিনও এসেছেন। কিন্তু এসেছেন সন্ধ্যের পরে, একটু দেবি ক'রে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তখন আর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব আছেন। বৈঠকখানাটি রসালাপে মুখর।

দীনবন্ধুকে দেখে সকলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। এসেছেন, দীনবন্ধু এসেছেন।

কিন্তু এত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র নিদারুণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। তাঁর মুখে অভ্যর্থনার লেশমাত্রও নেই। ব্যাপার কী?

আর কি, দীনবন্ধু বুঝলেন, তিনি নিজেই অপরাধী। তিনি দেবি ক'রে এসেছেন যে!

কিন্তু দীনবন্ধু সে-বিষয়ে একটি কথাও কইলেন না। উঠে গিয়ে হাতমুখ ধুলেন। খাবার চেয়ে নিয়ে জলযোগ সারলেন। তারপর আবার এলেন বৈঠকখানায়। দীনবন্ধুর সরস বার্তালাপে আসর সবগরম হ'য়ে উঠলো। বন্ধু-বান্ধবের হাসির দমকে ছাদ প্রায় উড়ে যাবার দশা।

কিন্তু আশ্চর্য, বঙ্কিমচন্দ্র তথাপি গম্ভীর। দীনবন্ধু লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাঙ্গ হেসে উঠতে চাইছে কিন্তু মুখে একবিন্দু হাসি নেই। দীনবন্ধু বুঝলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টায় হাসি চেপে রেখেছেন, মুখখানা স্বেচ্ছায় নিদারুণ গম্ভীর রেখেছেন।

দীনবন্ধু বৈঠকখানা ছেড়ে গেলেন বাগানে। সেখান থেকে নিয়ে এলেন কিছু লতাপাতাফুল। পাশের আরেকটা ছোটো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। একখানা বড়ো কাগজে আটা দিয়ে

লাগালেন কাটা-কাটা লতাপাতা। একটা মনুষ্যমূর্তি তো তৈরি হ'লো। সেই মূর্তিটির উদরটি বড়ো, ঠোঁটদুটি কুঞ্চিত। মূর্তির নিচে আবার দু-ছত্র কী যেন লিখলেন।

মূর্তিঅলা কাগজখানা নিয়ে দীনবন্ধু অতঃপর আবার এলেন বৈঠকখানায়। দেয়ালের গায়ে লটকে দিলেন কাগজখানা।

এ নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমূর্তি। উপস্থিত সকলে হেসে উঠলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হাসলেন না। উঠে গেলেন আরেকঘরে। একখণ্ড কাগজে দু-ছত্র কী লিখে নিয়ে এলেন। উপস্থিত সকলের দীনবন্ধুর লটকানো কাগজখানার দিকে নজর, এই অবসরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের দু-ছত্র লেখা কাগজটি আটা মাখিয়ে লাগিয়ে দিলেন দীনবন্ধুর পিঠে। এ দেখি আবার আরেক কাণ্ড। দু-জনের কেউ যে কারো চেয়ে কম যান না। সবাই দীনবন্ধুর দিকে ছুটে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কী লিখেছেন দেখি।

দীনবন্ধু কিন্তু বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হননি। তিনি পিছন ফিরে সকলকে কাগজখানি দেখাতে লাগলেন, বলতে লাগলেন---আমায় ব'লে দাও না গা, আমার পিঠে কী আছে। হাতির কপাল মন্দ, তাই তার পিঠে কোথায় মশাটা-মাছিটা বসছে সে দেখতে পায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে উঠলেন---দেখতে পায় না ব'লেই তো আমরা তাকে হস্তিমূর্খ বলি।

দীনবন্ধু তখন আবার আসরে বসলেন। একদিকে দীনবন্ধু আরেকদিকে বঙ্কিমচন্দ্র। একের প্রতি আরেকের মুখ ডেকে বর্ষিত হতে লাগলো বিচিত্র বাক্যবাণ। কিন্তু দুই দিকপতি সেদিন কোন ভাষায় রসালাপ করেছিলেন, কেউ তা সংগ্রহ ক'রে রাখেন নি, আমাদের তা জানবার কোনো উপায় নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য।

কিন্তু অন্যের কাছে যা হাস্যকর, দীনবন্ধুর কাছে তা সবসময় হাস্যকর নয়। বেশি কথা কি, মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হ'য়ে খানায় প'ড়ে আছে একটা লোক তাকে দেখে এমন কজন আছেন যে একটু রঙ্গব্যঙ্গ না করেন। অমন দুর্গতকে উপদেশ দেওয়ার মতো মানুষ আছে সংখ্যাতীত, অমন দুর্গতের চারপাশে একটু দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে ভিড় জমানোর মতো লোক আছে বিস্তর, কিন্তু অমন হতভাগ্যের যথার্থ পরোপকারী বান্ধবের সংখ্যা যৎসামান্য।

তেমনি একজন উদারহৃদয় মানুষ দীনবন্ধু মিত্র।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্তিকেয় চন্দ্র রায় আর দীনবন্ধু মিত্র। দুর্গাপূজোর এক রাত্রি। তিনজনে এক সঙ্গে নৈহাটি ষ্টেশন থেকে রাস্তায় নেমে হাঁটাপথ ধরেছেন। মাঝারি রকম জ্যোৎস্না ফুটেছে।

ষ্টেশন থেকে খানিক দূরে এসে রাস্তার পশ্চিমদিকের ড্রেনের মধ্যে দেখা গেলো একটা সাদা বস্তু মাঝে-মাঝে নড়ে-চড়ে। গোরু নাকি?

গোরু কিসের। কাছে এসে ঠাহর ক'রে দেখা গেলো গোরু-টোরু কিছু না, দিব্যি পোষাক-আসাক পরা এক যুবক মদের নেশায় খানার মধ্যে টান-টান হ'য়ে আছে।

মাতালের মুখ থেকেই দীনবন্ধু জেনে নিলেন যে উনি কলকাতা থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন, পথে ষ্টেশনের বাবুদের সঙ্গে মদ টেনে এখন খানায় শুয়ে আছেন। শ্বশুরের নাম? আজ্ঞে অমুক।

দীনবন্ধু বললেন--আপনি অমুকের জামাই!

তাহলে দীনবন্ধু শ্বশুরমশাইকে চেনেন। তবে আর কথা কি। সঙ্গে-সঙ্গে মাতালের প্রলাপ সুরু হ'য়ে গেলো—You know

my father-in-law, Sir, then you are my father-in-law, Sir, yes Sir, Son-in-law Sir, I Sir, son-in-law Sir !

মাতালকে সঙ্গে নেওয়া হলো। কিন্তু কী আশ্চর্য যেদিকে খানা তিনি সেদিকেই টলতে-টলতে এগোন। খানা দেখলেই মাতাল খানায় পড়তে চায়।

দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়িয়ে নিলেন। মাতালের বাঁ-হাতখানা শক্ত ক'রে ধরলেন।

দীনবন্ধুর নিশ্চয়ই রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। তাই পূর্ণচন্দ্র বললেন—আপনি ছেড়ে দিন, আমি কোনোমতে বাবুকে খানায় পড়তে দেবো না।

দীনবন্ধু বললেন –না হে না!

দীনবন্ধু মাঝে-মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করছেন, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে মাতাল যুবক উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু সব কথার শেষেই দীনবন্ধুর প্রতি তার একটি বাণী আছে—Yes Sir, Son-in-law Sir.

সমস্ত রাস্তা দীনবন্ধু মাতালটিকে ধ'রে গম্ভীরভাবে এসেছেন, একটিবারও তাঁর মুখে হাসির আভাসমাত্র দেখা যায়নি। বাড়ি পৌঁছে দীনবন্ধু শ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ তাঁকে বাতাস করতে হ'লো। আর খাইয়ে-দাইয়ে মাতাল বাবুটিকে পাল্কি ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো তার শ্বশুরবাড়িতে।

এই ঘটনা যখন ঘটেছে তখন পর্যন্ত 'সধবার একাদশীর' ভোলা মাতালের জন্ম হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —এই মাতালবাবুই 'সধবার একাদশীর' ভোলা মাতাল।

'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ দত্ত, কারো-কারো ধারণা, মধুসূদন

দত্তের ব্যঙ্গচরিত্র। কিন্তু সে-ধারণা স্বয়ং দীনবন্ধুই নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন—মধু কি কখনো নিম হয়?

দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বাড়িতে এসে কেঁদেছিলেন, আর কোথাও দীনবন্ধুর জন্যে তাঁর চোখে অশ্রুরেখা দেখা যায়নি। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে যেদিন তিনি দীনবন্ধুর বাড়িতে প্রথম আসেন, সেদিন আর অশ্রুধারা রুদ্ধ থাকেনি। দীনবন্ধুর হতভাগ্য পুত্রদের দেখলেন, দীনবন্ধুর বালিকা কন্যাকে কোলে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বহারার মতো কেঁদে উঠলেন। সেই কান্নার মধ্যে প্রবল পৌরুষের চিহ্নমাত্র নেই। যেন একটি সরল শিশুর সরব কান্না, যেন একটি রোধবন্ধহীন কূলপ্লাবিনী অশ্রুধারা।

কিন্তু অত্যাশ্চর্য কাণ্ড, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে সমস্ত বঙ্গসমাজ যখন শোকাকুল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' দীনবন্ধুর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কেন করেননি? কিছুকাল পরে 'বঙ্গদর্শন' যখন প্রথমবারের মতো বিদায় নেয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন দীনবন্ধুর নামোল্লেখ ক'রে সেকথা বলেছেন—এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাঁহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না!

কিন্তু দীনবন্ধুর কথা বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে বলেছেন। পরে বলেছেন।

বন্ধুর মৃত্যুর পরে কে আর তার আত্মীয়-পরিজনের খবর রাখে? কিন্তু দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মৃত হননি দীনবন্ধুর সংসারটি। দীনবন্ধুর পুত্রদের তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ঘন-ঘন তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। প্রয়োজন হ'লে পরামর্শ দিয়েছেন নানারকম।

দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের পরামর্শও বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়েছেন দীনবন্ধুর পুত্রদের। বঙ্কিমচন্দ্র স্বতপ্রবৃত্ত হ'য়ে তখন একখানা জীবনী লিখে দিয়েছেন দীনবন্ধুর। সেখানা ছাপা হয়েছে দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর গোড়ায়। এমন কি, সেই জীবনীখানা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপাবার অনুমতি দিয়েছেন দীনবন্ধুর পুত্রদের। সে-ই জীবনীর অতঃপর দীনবন্ধুর পুত্রেরাই প্রকাশক, দীনবন্ধুর পুত্রেরাই সেই জীবনীর উপস্বত্ব ভোগ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সেই দীনবন্ধু-জীবনী থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :—

দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০৲ বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড় শত টাকার পোষ্টমাষ্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের কার্য্যের নিয়ম এই ছিল

যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্টআপিসের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না। বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতই তিনি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্রবৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি নীল-দর্পণের প্রণেতা, একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের

সুহৃদ। বিশেষ, পোষ্টআপিসের কার্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এসকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়েব অসাধারণ গুণ এই ছিল, যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম, যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লংসাহেব

তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে-যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন…।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।…

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র

গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্রগুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছুদিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেকদিন হইতে দীনবন্ধু উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কিনা বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচার-বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম, যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।...."

দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি

প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন মনুষ্যলোকে—চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব—অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধু মধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন, বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহাব বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবন-স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত • গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরস-পটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্য-রসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ

মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী। এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্ব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, একদিন তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল ? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচিবে না।" দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "কে বলিল ?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাঁহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শুখাইয়াছে কিনা আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে, সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েকবার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক,

প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটি বাম পদে হইল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।"

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে; দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্য-মাত্রেরই রাগ আছে; —দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখনও তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, "কই, রাগ যে হয় না।"···

যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতক-গুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না; যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চির-বিরোধ, দোষমুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালোবাসে, সামান্য ব্যক্তির

নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্ব্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন "নবীন তপস্বিনী" প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেইজন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরির উমেদারী করিয়া নিস্ফল হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।...

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎ কার্য্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্য্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ

হয়। •দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিনী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।···

এগারো

বন্দে মাতরম্।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কখনো দু-এক পাতা ম্যাটার কম পড়লে সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদককে লিখে দিতে হ'তো। তেমনি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে এসেছেন—একপাতা ম্যাটার চাই। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, আজই পাবে।

টেবিলের ওপর একখানি কাগজ প'ড়ে আছে। 'বন্দে মাতরমে'র পাণ্ডুলিপি।

সেই ব্যক্তি বললেন—দেরি হ'লে কাজ বন্ধ থাকবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, ওটা মন্দ না তো—ওটিই দিন না।

মন্দ না তো? বিরক্ত হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র টেবিলের ওপর থেকে কাগজটি সরিয়ে নিয়ে দেরাজের মধ্যে রাখলেন। বললেন—ওটা ভালো কি মন্দ, এখন তুমি বুঝবে না, কিছুকাল পরে বুঝবে, তখন আমি খুব সম্ভব জীবিত থাকবো না, তুমি থাকতে পারো।

শুধু কি সেই ব্যক্তি। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে নবীনবাবুর মতো মানুষও একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছেন—এমন ভালো জিনিসটিকে আধ-সংস্কৃত আধ-বাঙলায় লিখে মাটি করা হয়েছে। এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গান। লোকের ভালো লাগে না।

—ভালো না লাগে, প'ড়ো না। আমার ভালো লেগেছে তাই আমি ওরকম লিখেছি।—দৃঢ়কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—লোকের ভালো লাগবে কি লাগবে না তাই ভেবে আমি লিখবো?

এই হ'লো বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র।

এগারো বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিয়ে হয়। পাত্রীর বয়স পাঁচবছর।

ন-বছর বয়স যখন বৌটির, তখনকার একটা ঘটনা বলি।

কী খেয়াল হয়েছে কে জানে, বঙ্কিমচন্দ্রের দু-একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে পুতুলেব বিছানা বানালো বৌ। কতো বয়স তখন বঙ্কিমচন্দ্রের? পনেরো বছর। নিজের কবিতার ঐ দুর্দশা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। বৌকে বললেন—তুমি আমার কবিতা ছিঁড়লে কেন? তুমি আমাব জামা-কাপড় ছিঁড়ে পুতুলকে শোয়ালে না কেন?

বৌটি বললো—আচ্ছা, আমি কাগজগুলো আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—জোড়া কাগজ নিয়ে কি আমি গলায় গাঁথবো? তুমি কি ভাবো আমি আর লিখতে পারবো না? আজই লিখবো।

একলা ঘরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাত একপ্রহর অবধি লিখলেন। দরোজা খুলে যখন বেরোলেন, হাতে একতাড়া কাগজ। কাগজের তাড়াটি বৌয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বললেন—ছাখো লিখেছি কি না।

তা এই বৌটি ষোল বছর বয়সে মারা গেলো। এই বৌটির জন্যে বাইশ বছরের যুবক স্বামী নির্জনে ব'সে অনেক অশ্রুপাত করেছেন।

মা-বাবার আদেশে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন আর কি। ঘটক লাগানো হ'লো, পাত্রীর সন্ধান চললো দিগ্বিদিকে।

একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পেয়ে সঞ্জীবচন্দ্র তাকে দেখতে গেলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মামাবাড়ি কোথায় ?

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললেন—কে জানে বাপু কোথায়। আমি কখনো সেখানে যাই না।

উত্তরের মধ্যে কেমন একটা কুশ্রী স্পর্ধা। সঞ্জীবচন্দ্র আর কথাটি কইলেন না। না, এ-মেয়ে চলবে না।

পাত্রী অনুসন্ধানের জন্যে মস্ত আয়োজন হ'লো তারপর। বিশাল একখানা বজরা ভাড়া করা হ'লো। সঞ্জীবচন্দ্র আর দীনবন্ধু মিত্র সেই বজরায় চেপে দশদিকে পাত্রী খুঁজে বেড়াবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গী হলেন।

শেষপর্যন্ত হালিসহরের একটি মেয়েকে পছন্দ হ'লো। সদ্য-রোগমুক্ত একটি রুগ্ন, শীর্ণকায় মেয়ে। সঞ্জীবচন্দ্রের আপত্তি ছিলো এ-বিয়েতে, কিন্তু আপত্তি টিকলো না। বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে বসলেন—আমি একেই বিয়ে করবো।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর আটমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ে হ'লো।

বঙ্কিমচন্দ্র ষাঁড়গোরু দেখলে আর সেখানে থাকেন না। ষাঁড়-গোরু দেখলে ভয় পান, কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রয়োজন হ'লেই বঙ্কিমচন্দ্র অসীমসাহসী।

বালক বঙ্কিমই কি কম সাহসের পরিচয় দিয়েছে !

গোরার বহর লেগেছে গঙ্গার ঘাটে, এই সংবাদ শোনামাত্র আবালবৃদ্ধবণিতা পলাতক। পাততাড়ি ফেলে পাঠশালার ছাত্রেরা

উধাও, গুরুমশায় চটিজুতোসমেত দ্রুতগতিতে অদৃশ্য, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেলো। পথ-ঘাট নির্জন, সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল বঙ্কিম দরজা বন্ধ করেনি। দরজার সামনে বঙ্কিম গুরুমশায়ের বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গোরারা এলো, বঙ্কিমের সঙ্গে দু-একটা কী কথাবার্তা হ'লো, বঙ্কিমের হাতের বেতখানা নিয়ে একটু দেখলো, বালক বঙ্কিম নির্ভয়। তারপর গোরারা একসময় বিদায় নিলো। সব যেমন-কে তেমন।

ষাঁড়গোরুর ভয়ে বঙ্কিম পালায়, কিন্তু কই গোরার ভয়ে তো পালালো না।

বাইশ-তেইশ বছর বয়স বঙ্কিমচন্দ্রের, খুলনা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট। খবর এলো, একজন নীলকর সাহেব হাতির শুঁড়ে মশাল বেঁধে একখানা গ্রাম ভস্ম ক'রে দিয়েছে।

বটে ? অবিলম্বে গ্রেপ্তার করো ঐ নীলকর সাহেবকে।

কিন্তু হায়, কে তাকে গ্রেপ্তার করে। তার হাতে সবসময় গুলিভরা পিস্তল থাকে। কোনো দারোগাই তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহসী হ'লো না।

কিন্তু গুলিভরা পিস্তলের পরোয়া না ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রই গ্রেপ্তার করলেন ঐ নীলকর সাহেবকে।

বাল্য ও যৌবনের সাহসী বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখলাম। কিন্তু এবার অন্তত একবারের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক কৈশোরের চেহারাটি দেখি।

বহুকাল বঙ্কিমচন্দ্র নৌকোয় চেপে কলেজে গেছেন। কোনো-কোনোদিন নৌকো হয়তো মধ্যনদীতে এসেছে, অকস্মাৎ দেখা গেলো মেঘে-মেঘে দিকদেশ আচ্ছন্ন। তরঙ্গসঙ্কুল নদী।

কোথাও কোনো আশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই, সমস্ত আকাশ-বাতাস উন্মত্ত। যেন সমগ্র সৃষ্টি অবিলম্বে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে, যেন এই নৌকো ইহজীবনে আর কখনো কলেজের ঘাটে গিয়ে ভিড়বে না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখন নির্ভয়। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি তখন মাতা-প্রকৃতির একটি বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

একদিন সকালে প্রচণ্ড কুয়াসা। কোথাও কিছু দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নৌকোয় উঠলেন। কিন্তু মাঝি নৌকো ছাড়তে চায় না। দিক একেবারে ঠাহর হয় না, মাঝি কোন ভরসায় নৌকো ছাড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রও ছাড়েন না। নৌকো ছাড়তেই হবে।

অগত্যা নৌকো ছাড়া হ'লো। কিন্তু এ কী। দশ-পনেরো মিনিটে নৌকো কলেজের ঘাটে গিয়ে লাগবার কথা, এদিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'য়ে গেলো, কোথায় কী। নৌকো শুধু ভাঁটার জলে ভেসে যাচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে বললেন—কোথায় যাচ্ছিস রে।

মাঝি বললো—আজ্ঞে, তা জানি না। বোধ হয় ভাঁটার টানে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।

হাল ছেড়ে মাঝি ব'সে আছে। নৌকো ভেসে চলেছে। প্রগাঢ় কুয়াসায় চরাচর নিশ্চিহ্ন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে একটি আনির্বাণ হাস্যরেখাচিহ্ন।

শেষপর্যন্ত আপনা থেকেই নৌকো কূল পেলো একসময়ে। এ কোন জায়গা ?

মাঝি বললো—বোধ হয় মূলাযোড়।

'কপালকুণ্ডলা'য় একটি অত্যাশ্চর্য কুয়াসাচ্ছন্ন দৃশ্য আছে। এই ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সূক্ষ্ম যোগসূত্র থাকা বোধ করি অসম্ভব নয়।

হুগলী থেকে হাওড়ায় বদলি হ'য়ে এলেন ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তখন প্রবল প্রতাপান্বিত বক্‌লণ্ড সাহেব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র প্রসন্ন নন।

একটা ঘটনায় দু-জনের মধ্যে একেবারে অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে গেলো। সে-ঘটনার মূলেও অবশ্যি অগ্নির সম্পর্ক আছে।

'Combustible' শব্দটির বাঙলা নিয়ে সমস্ত গণ্ডগোল। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নোটিশ বেরোলো, ঘরের চালে কেউ কোনো Combustible বস্তু ব্যবহার করতে পারবে না। নোটিশটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন ডনিথর্ণ সাহেব। 'Combustible' শব্দটির তিনি বাঙলা করেছিলেন 'জ্বলীয়' নাকি 'জলীয়'?

যাই হোক, ঐ 'Combustible' শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দ নিয়েই একটা অনর্থ বেধে গেলো।

ঐ নোটিশ পেয়ে এক বুড়ী গেলো পাশের বাড়ির এক ভদ্র-লোকের কাছে। নোটিশের মর্মার্থ ভদ্রলোকটি বুড়ীকে জলের মতো বুঝিয়ে দিলো। মর্মার্থ আর কি, জল দিয়ে ঘর ছেয়ো না।

ভদ্রলোকটি অবশ্যই একজন মহাপণ্ডিত!

যাক জল দিয়ে ঘর ছাওয়া বারণ। বুড়ী একেবারে নিশ্চিন্ত। বুড়ীর অবশ্যি একখানা গোলপাতার ঘর আছে, কিন্তু জলের ঘর তো নেই। আর, আসল কথা, জল দিয়ে ঘর ছাওয়ানোর কোনো বাসনাও নেই বুড়ীর।

তবু সাবধানের বিনাশ নেই। আইন যখন জলের ওপর খড়্গহস্ত, তখন আর উপায় কি। গোলপাতার চালে যাতে বিন্দুমাত্র জল না লাগে, বুড়ীর সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি রইলো। ফলে, গোলপাতার চালও রইলো পুরোপাক্কা Combustible হ'য়ে।

তারপর একদিন মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে বুড়ীকে ধ'রে

নিয়ে গেলো। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বুড়ীর নামে ফৌজদারী রুজু করলেন। অপরাধ গুরুতর। এই বুড়ীর ঘর Combustible পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বুড়ী মিউনিসি-প্যালিটির নোটিশ অমান্য করেছে।

বিচারের ভার পড়লো বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দোষ বুড়ীকে খালাস দিলেন। রায় দিলেন, নোটিশের অর্থ বোধগম্য হইল না। নোটিশ insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।

আসামীটি তো খালাস হ'লো, ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহাক্রুদ্ধ। নথিপত্র নিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের ওপরেই মন্তব্য লিখলেন—Bankim Chandra's vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgement.

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই কি অন্যায় কথা শুনে চুপ ক'রে থাকবার মানুষ। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন—You are not my judicial superior officer, and you have no right to criticise my judgement.

শুধু কি এই? বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন—এজন্যে আপনি যদি একমাসের মধ্যে আমার কাছে ক্ষমা না চান, আপনি কাগজপত্রগুলো কমিশনার সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

একমাস যায়। ম্যাজিস্ট্রেট না চাইলেন ক্ষমা, না পাঠালেন কাগজপত্রগুলো কমিশনার সাহেবকে। কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে, সব রোষ শান্ত হবে?

কিছুদিন পরে স্বয়ং কমিশনার সাহেব এলেন হাওড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন ইতিবৃত্তান্ত।

দেওয়ালের কান না থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সেরেস্তাদারের দুটো কান চিরকালই অতিসতর্ক। ব্যাপার টের পেয়েই তিনি সটান ছুটলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। সাহেব, সর্বনাশ।

কমিশনার হলেন ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরালা। বঙ্কিমচন্দ্রকে ম্যাজিস্ট্রেট ভয় না করতে পারেন, কিন্তু কমিশনার যে ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাপের বাপ।

অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন না হ'লে এখন আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মান থাকে না। দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রকে মিষ্টকথায় যদি একটু নরম করা যায়। যদি হাওয়া অনুকূলে বয়। যদি শেষ পর্যন্ত মানরক্ষা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এলেন উগ্র আদেশ-কর্তার ভঙ্গিতে নয়, এলেন প্রার্থীর নম্রতা নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু আর্দ্র করবার জন্যে বললেন--Have you seen, Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual report?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন,- It is not my habit to inquire what District Magistrates write about me in their reports.

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তথাপি হাল ছাড়লেন না। বললেন— I have spoken very highly of you.

তাতেও বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিত হলেন না। বললেন—I don't care to know that.

না, এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মন পাওয়া যাবে না। ঘোরপ্যাঁচের পথ ছেড়ে সাহেব অগত্যা সোজা রাস্তায় নামলেন। বললেন—

বঙ্কিমবাবু, কিছুদিন আগে আমি আপনার রায়ের ওপর একটা মন্তব্য লিখেছিলাম। সেসব কাগজপত্র আপনি কমিশনারকে পাঠাতে লিখেছিলেন। আমি পাঠাইনি। আমার অনুরোধ সে-লেখা আপনি ফিরিয়ে নিন।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—কিন্তু আপনি ক্ষমা না চাইলে আমি কিছুতেই সে-লেখা ফিরিয়ে নেবো না।

সাহেব বললেন—ম্যাজিস্ট্রেটের একটা প্রেষ্টিজ আছে স্বীকার করেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—আছে। কিন্তু সবাই তা রাখতে জানে না।

উপায়ান্তর না দেখে সাহেব বললেন—আচ্ছা বঙ্কিমবাবু, এক কাজ করি। আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি, আপনিও আপনার লেখা ফিরিয়ে নিন।

তা এ-প্রস্তাব মন্দ নয়। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজি হলেন।

তারপর থেকে এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ থেকেছেন।

একটা রেলওয়ে-কেস নিয়ে আরেকবার আরেকজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে মুস্কিলে ফেলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সাহেবের নাম ওয়েষ্ট ম্যাকট।

একটা রেলওয়ে-কেসের বিচার। বঙ্কিমচন্দ্র আসামীদের মুক্তি দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাতে মহারুষ্ট। তাঁর আর সবুর সইল না। তিনি একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এসে উঠলেন। এজলাসের সম্মানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাথার টুপিটি হাতে নিলেন,

বললেন—Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case !

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আরেকটি মোকদ্দমা দেখছেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। বললেন—What of that ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন—You ought to have convicted the accused.

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty.

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন—You have done wrong, and you ought to be told so.

বঙ্কিমচন্দ্রের আর সহ্য হ'লো না। আর কথাটি না ব'লে তিনি সাহেবের বিরুদ্ধে লেখা সুরু ক'রে দিলেন। সাহেব আদালতের অবমাননা করেছেন। সেটা অবশ্যই আইনত অপরাধ। কিন্তু সে-অপরাধ করেছেন কে? একজন শাদা সাহেব। আর তাঁর বিরুদ্ধে বাক্য লিখবে কিনা অধীনস্থ একজন কালো নেটিভ !

লিখবে কি, লেখা এতক্ষণে হ'য়ে গেলো বোধ হয়। শত হ'লেও সাহেব বুঝলেন এ-ব্যাপার অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে একটা মস্ত কেলেঙ্কারি হ'য়ে যেতে পারে। অতএব থাক। সাহেব নত হলেন। ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে।

বঙ্কিমচন্দ্র থামলেন।

•

কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র দুদিন ব'সে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি প'ড়ে শোনাচ্ছেন কয়েকজন শ্রোতাকে। নিবিষ্ট হ'য়ে শুনছেন শ্রোতারা। সকলে নিঃশব্দ, শুধু মাঝে মাঝে একজন বৃদ্ধ চিৎকার ক'রে উঠছেন—আ-মরি, আ-মরি !

পড়া শেষ হ'লে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বললেন, ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে, লক্ষ্য করেছেন ?

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বললেন—গল্প ও ভাষার মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর কোন দোষ-টোষের দিকে মন দিতে পারি নি।

চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বললেন—কোথাও কোথাও দোষ হয়েছে বটে, কিন্তু সেসব জায়গায় ভাষা আরো মধুর !

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পরে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি খড়গহস্ত হয়েছিলেন। এ কেমনতরো ভাষা !

আরো একটি অভিযোগ আছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' নাকি 'আইভান হো' প'ড়ে লেখা। কিন্তু এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ কথা ব'লে গেছেন—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখবার আগে আমি 'আইভান হো' পড়িনি।

বিস্তর নিন্দা হয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী'র। তবুও কিম্বা সেজন্যেই হয়তো এখানা বিক্রীও হয়েছে প্রচুর। ১৮৮৮ সালে একাদশ সংস্করণ বেরোয় 'দুর্গেশনন্দিনী'র। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—এই বইখানার লোকে যত নিন্দা করেছে, তত আর কোনো বইয়ের করেনি ; তাই এ-বইয়ের বিক্রী বেশি।

শুধু কি নিজে লিখেছেন। বহু বাঙালীকে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার যোগ্য সেবক করেছেন। বহু লেখককে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আপন বিচারে নিজের রচনার মধ্যে কোন গ্রন্থখানা সর্বশ্রেষ্ঠ ?

সান্‌কিভাঙ্গার বাড়িতে একদিন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মশাই বেড়াতে এসেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—

আপনার রচনার মধ্যে কোন গ্রন্থখানাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন ?'

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন —তুমি বলো দেখি।

কৃষ্ণধন হাসলেন। বললেন আমি মুখে বলবো না, কাগজে লিখে রাখছি। দেখি আপনার সঙ্গে আমার মত মেলে কি না।

একখানা কাগজে কৃষ্ণধন লিখলেন গ্রন্থের নাম। লিখে কাগজখানা চাপা দিয়ে রাখলেন।

কিন্তু বঙ্কিচন্দ্র নিজের রচনার মধ্যে কোন গ্রন্থখানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেন ? বললেন কমলাকান্তের দপ্তর।

কৃষ্ণধন কাগজখানি উল্টে দেখালেন। আশ্চর্য, তিনিও লিখে রেখেছেন—কমলাকান্তের দপ্তর।

কঠিন অসুখ হ'লো একবার বঙ্কিমচন্দ্রের। দাঁত দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়ে। তিনছটাক পরিমাণ রক্ত পর্যন্ত পড়ে কোনোদিন।

অবস্থা যখন খারাপের দিকে, তখন একদিন মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডেকে আনা হ'লো চন্দ্রা সাহেবকে। দেখে-শুনে চন্দ্রা সাহেব বললেন গীতাপাঠ বন্ধ রাখতে হবে, কথাবার্তাও কমাতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রত্যেকদিন অনেকক্ষণ গীতাপাঠ করতেন। ডাক্তারের উপদেশ শুনে বঙ্কিমচন্দ্র একটু হাসলেন।

চন্দ্রাসাহেব প্রেসক্রিপসন দিয়ে চ'লে গেলেন। বাড়ির দারোয়ান ওষুধ নিয়ে এলো। ওষুধ রাখা হ'লো বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে। ছিপি খুলে শিশির ওষুধ বঙ্কিমচন্দ্র উজাড় ক'রে ঢেলে ফেললেন পিকদানিতে, উচ্চকণ্ঠে সুরু করলেন গীতাপাঠ।

রোগ রইলো অনড় হ'য়ে। দাঁত থেকে নিয়মিত রক্ত পড়ে। শরীর দুর্বল হ'লো। বঙ্কিমচন্দ্র শয্যা নিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এলেন। অনেক রকম ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে কোনো তর্ক নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই, আছে কেবল একটি সর্বজয়ী হাস্যরেখা।

মহেন্দ্রলাল বললেন—তুমি আত্মহত্যা করছো।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—কিসে?

মহেন্দ্রলাল বললেন—যে ওষুধ খায় না, সে আত্মঘাতক।

—কে বললে আমি ওষুধ খাই না?

—খাও? কই তোমার ওষুধ?

বঙ্কিমচন্দ্র আঙুল দিয়ে ওষুধ দেখালেন। একখানা গীতা।

যাবার আগে মহেন্দ্রলাল ব'লে গেলেন—তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা।

অসুখ দিনের পর দিন বেড়ে চললো। বিছানায় শুয়েও আর গীতাপাঠের শক্তি রইলো না। একদিন রাত্রে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠলো। এই রাত্রিই বুঝি শেষ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঠোঁট নড়ে কেন? উনি কি কিছু বলছেন? বলছেন বৈকি। প্রায় অচেতন বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছেন একের পর এক গীতার শ্লোক।

ঈশ্বরের দয়া, সেযাত্রা বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষা পেলেন।

তার তিনচার বছর পরে কার্তিক মাসের একটি বিকেলে চ'লে আসি।

একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের। তাতে চেপে বিকেলের দিকে তিনি দৌহিত্রদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন।

কার্তিক মাসের এক বিকেলে তেমনি বেরোবার উদ্যোগ করছেন,

এমন. সময় সদর দরজার কাছে একটা গোলমাল উঠলো। হ'লো কী ?

কে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। বয়স বেশি নয়। জটাজুটধারী সন্ন্যাসী নন, একজন আড়ম্বরশূন্য সাধক। তিনি ভিক্ষুক নন। তিনি সন্ন্যাসী। এই মুহূর্তেই বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী। তিনি দারোয়ানকে বললেন -আমি ভিক্ষা চাই না, বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কিন্তু দারোয়ানজি সন্ন্যাসীকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।— বাবুর সঙ্গে এখন মোলাকাৎ হবে না। ফজিরমে আইয়ে, বাবু আভি ঘুম্‌নে যাতা হ্যায়।

সন্ন্যাসী আর কি করেন, পথের একপাশে ব'সে পড়লেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রের সঙ্গে বাইরে এলেন। এটুকু পথ হেঁটে গিয়ে বড়ো রাস্তায় গাড়িতে উঠবেন।

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রখরদৃষ্টিতে দেখলেন সন্ন্যাসীকে। বঙ্কিমচন্দ্র থামলেন না, হাঁটতে লাগলেন।

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। পিছন থেকে ডাকলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে—খাড়া হো।

বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়ালেন। তাকালেন সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী বললেন—তুম্‌হারা নাম বঙ্কিমচন্দর ?

বঙ্কিমচন্দ্র ঘাড় নাড়লেন। হ্যাঁ।

সন্ন্যাসা বললেন -তুম্‌হারা ওয়াস্তে ম্যঁায়্ নেপালসে আতা হুঁ—লউট্‌কে আও।

বঙ্কিমচন্দ্র কোনো কথা বললেন না। ফিরলেন। সন্ন্যাসীকে নিয়ে এলেন ওপরের ঘরে।

সেই ঘরে ব'সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কী কথা হয়েছিলো, নিশ্চিত বলা যায় না। সন্ন্যাসী নাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন আমার গুরু নেপালে থাকেন। তাঁর আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। পূর্বজন্মে আমরা এক গুরুর শিষ্য ছিলাম। কর্মফলে এ-জন্মে তুমি সংসারে এসেছো, আমি আবার পূর্বজন্মের গুরুকে পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—গুরুদেব আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন কেন?

সন্ন্যাসী বললেন -সেকথা আরেকদিন বলবো।

সন্ন্যাসী একটি রুদ্রাক্ষ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বললেন -যতদিন বেঁচে থাকবে, রোজ এই রুদ্রাক্ষটিকে পূজো করবে।

পূজোর নিয়ম ব'লে দিলেন সন্ন্যাসী। আরো কিছু উপদেশ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। এককণা জলগ্রহণ করলেন না, একতিল ভিক্ষা নিলেন না, সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

কিন্তু কেউ কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই রুদ্রাক্ষের পূজো করতে দেখেনি।

তিনমাস পরে আরেক প্রচণ্ড শীতের দুপুরে আবার সেই সন্ন্যাসী এলেন। সরাসরি চ'লে এলেন ওপরের ঘরে। বঙ্কিমচন্দ্র যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন।

সন্ন্যাসী বললেন -বঙ্কিমচন্দর, এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা কি মনে আছে?

—মনে আছে।

—তবে প্রস্তুত হও।

ঘরের দরজা বন্ধ হ'লো। ঘরের মধ্যে রইলেন শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, আর সেই সন্ন্যাসী। দু-জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিলো, তা অদ্যাবধি রহস্যাবৃত।

কয়েকঘণ্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দরজা খুলে বেরোলেন, তখন তাঁর সমস্ত মুখে বজ্রগর্ভ মেঘের গাম্ভীর্য।

সেই শীতকালেই বহুমূত্র রোগে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। চিকিৎসার কথা উঠলো। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন চিকিৎসা করাতে চাও, করো। তোমাদের মনে আমি কোনো আক্ষেপ থাকতে দেবো না।

কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল দেখা গেলো না। বসন্তকালে বঙ্কিমচন্দ্র শয্যাশায়ী হলেন। একদিন বললেন এ-যাত্রা কিছুতেই আমার নিস্তার নেই।

একজন ডাক্তার একদিন বললেন এ-যাত্রা নিস্তার পেলেন। এবার আর কোনো ভয় নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র একটু হাসলেন। বললেন ভয় পুরোপুরি আছে। এ-যাত্রা কিছুতেই আমার নিস্তাব নেই।

কিন্তু এই সর্বনাশের কথা বঙ্কিমচন্দ্র কেন উচ্চারণ করলেন? তিনি কি আগেই আপন মৃত্যুর কথা অবগত হয়েছিলেন? পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর কাছেই কি তিনি জেনেছিলেন যে শেষের সেই ভয়ঙ্কব দিন সমাগত? কে জানে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়িতে তাসের আড্ডা বসেছে। অক্ষয়-কুমার বড়ালও আছেন সেখানে। খবর এলো বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত।

তাস ফেলে সবাই ছুটলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির দিকে। শ্লিপ ছাপিয়ে অবিলম্বে সহরময় শোকসংবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করলেন সুরেশচন্দ্র।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কে বলবে ইনি মৃত। হয়তো ইনি ঘুমিয়ে আছেন, হয়তো এখনি ইনি জেগে উঠবেন, হয়তো এই মৃত্যু সত্য নয়। হয়তো!

॥ সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকের উপাদান প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রগুলি থেকে সংগৃহীত ঃ

আত্মচরিত	শিবনাথ শাস্ত্রী
আমার জীবন	নবীনচন্দ্র সেন
কথোপকথন	উইলিয়ম কেরী (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-মালা, ১৩-সংখ্যক পুস্তক, সজনী কান্ত দাস লিখিত ভূমিকা।)
পুরাতন-প্রসঙ্গ	বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত
বঙ্গভাষার লেখক	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
বঙ্কিম-জীবনী	শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য	কেদারনাথ মজুমদার
বাংলা সাময়িক-পত্র	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মধু-স্মৃতি ...	নগেন্দ্রনাথ সোম
রঙ্গলাল	মন্মথনাথ ঘোষ
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত
Memoir of William Carey	Eustace Carey

মঞ্জরী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, The Statesman.